— শুচি-শুদ্ধ সজীব পল্লী-চিত্র —

পল্লী-লক্ষ্মী

'এসো সোনার বরণী রাণী গো, শঙ্খ-কমল করে,
এসো মা লক্ষ্মী, ব'সো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে।'

চতুর্থ সংস্করণ

১৩৩৪

কাব্যানন্দ—

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৲ এক টাকা

— প্রকাশক —

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির পরিচালিত

নির্ম্মল-সাহিত্য-পীঠ

৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, (ঠনঠনে কালীতলা)

কলিকাতা।

কলিকাতা,

৯ নং শিবনারায়ণ দাস লেন,

নিউ আর্য্য মিশন প্রেস

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল দ্বারা মুদ্রিত।

প্রীতি উপহার
শ্রী

N.Doss

পল্লী-লক্ষ্মী

(ধর্ম্ম-উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোপাল এক মনে অনেকক্ষণ গীতা পাঠ করিল, পড়িতে পড়িতে গোলমাল বোধ হইল। সে আপন মনে কহিল, 'ভগবানের কথায় তো ভ্রম বিরুদ্ধবাদ থাকবে না ; গীতায় যে আগা গোড়া বিরুদ্ধ কথা।' এই বলিয়া গোপাল অনেকক্ষণ নীরবে ভাবিল—আবার একমনে গীতা পড়িতে লাগিল—গীতা ছাড়িয়া আবার ভাবিতে লাগিল। সে একবার পড়ে—একবার ভাবে, আবার পড়ে—আবার ভাবে। অবশেষে উচ্চকণ্ঠে কহিল, 'না, এ কিছু বুঝবার যো নাই। এই কি ভগবানের বাক্য! তাই তো, এতে ধর্ম্মের কথা তো কিছুই বুঝলেম না। মানব-জীবনে ধর্ম্মটা যদি না বুঝলেম তবে আর বুঝলেম কি, আর জীবনটাই বা কেন?

মানব-জীবনে আর কীট পতঙ্গের জীবনে প্রভেদ রইল কি?'
একটু পরে প্রবোধ আসিয়া কহিল, 'এতো ভাবছ কি? ধর্ম্মের কথা ভেবে ভেবে তুমি দেখছি মাথা খারাপ করে ফেলবে।'

গোপাল হাসিয়া কহিল, 'ধর্ম্মের কথা ভাবলে যে মাথা খারাপ হয়, সে মাথায় দরকার কি! ধর্ম্মের কথা ভাববার জন্যই তো মানুষের মাথা।'

প্রবোধ কহিল, 'পরমহংসদেব তাই বলতেন। আর পণ্ডিত শাস্ত্রী ঠিক ঐ উত্তরই দিয়েছিলেন। শাস্ত্রী বলেন—ভগবানের কথা বেশী ভাবলে মাথা খারাপ হয়।'

গোপাল কহিল, 'তা হয় হোক। সার সত্য ছেড়ে অসার অসত্য ভাবতে পারি না।'

প্রবোধ সদর্পে কহিল, 'যদি ভগবানকে সার সত্য বলে বুঝে থাক, তবে তাঁর তৈরি সংসার-সমাজকেও সার সত্য বলে ধরো না কেন? সে গুলো তো প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষকে ধরে কাজ করে যাও।'

গোপাল কহিল, 'কোমট তাই ধরে পজিটিভিজমের প্রকাণ্ড অট্টালিকা গাঁথতে চেষ্টা করেছিলেন। শেষটা ভেঙে পড়ে গেল।'

প্রবোধ...ভাঙলো কেন?

গোপাল...বনেদ কাঁচা ছিল বলে। গোড়ায় ভগবানকে না ধরলে, কিছু গাঁথা যায় না।

প্রবোধ...প্রকৃতিকে ধরেই ধর্ম্মের সিঁড়িতে উঠতে হয়,

আমাদের পক্ষে এখন সেইটাই পথ। দেশ-মাতৃকাই এখন আমাদের প্রকৃতি—জননী জগদ্ধাত্রী।

গোপাল…কেবল কাব্য-কথায় প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, মাথা মানতে চায় না।

প্রবোধ…মাথা প্রাণকে জোর করে মানিয়ে নিতে হবে।

দেহের জড়তা ভাঙ্গিয়া গোপাল কহিল, 'দেখা যাক্। তুমি তো একজন বড় ডাক্তার; তোমার হাতে পড়িছি কোথায় গিয়ে দাঁড়াই। তুমি ক'লকাতা যাচ্ছ কবে?'

প্রবোধ…আজই, একটু পরেই। উঠি, আমার বেলা হ'লো। চিঠি লিখলে জবাব দিও। ছেলেগুলোকে নিয়ে, পুকুরটা যাতে পরিস্কার হয় তার বিশেষ চেষ্টা ক'রো, পচা পাতা আর পানায় পুরে আছে—ঐটাই গাঁয়ে ম্যালেরিয়ার গোড়া।

গোপাল কহিল, 'গাঁ ত' মরেই গেছে আর ম্যালেরিয়ায় করবে কি?'

প্রবোধ…না না, এখনও গ্রামটা সম্পূর্ণ মরেনি, এখনও চেষ্টা কল্লে বাঁচতে পারে। গাঁ বাঁচাতে গেলে আগে ম্যালেরিয়াকে তাড়াতে হবে—কেরোসিনে মশার বনেদ মারতে হবে।

গোপাল…ও থিওরিটা আমার বড় ভাল লাগে না।

প্রবোধ উঠিয়া কহিল, 'থাক্, সে তর্কের সময় এখন আমার নেই দাদা, আমি চল্লেম। বৌদিদিকে আমার নমস্কার দিও, ব'লো, তাড়াতাড়িতে এবারে তাঁর পায়ের ধূলো নিতে পাল্লেম না।'

নিদাঘের নবীন নীরদের ন্যায় শান্তি-বারি বক্ষে করিয়া মৃদু-মধুর হাস্যময়ী নয়নবৌ আসিয়া উভয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল। প্রবোধ তাড়াতাড়ি বৌদিদির পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

নয়নবৌ ব্যস্তভাবে প্রবোধকে বাধা দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, 'একি, একি ঠাকুরপো, আমার পায়ের ধূলো তুমি নেবে!'

প্রবোধ অস্ফুট স্বরে কহিল, 'তোমার মত সতী সাবিত্রীর পায়ের ধূলোয় ধরা ধন্য হয়, আমি তো কোন ছার!' প্রকাশ্যে কহিল, 'শুধু পায়ের ধূলোয় তো পেট ভরবে না, ঘরে খাবার কিছু আছে তো দাও, অনেকদিন তোমার হাতে কিছু খাইনি। মা মরে অবধি তোমার হাতে ছাড়া মিষ্টি জিনিষ আর দুনিয়ায় কোথাও খাইনি বৌদি।' মনে মনে কহিল, 'সত্যই তুমি অমৃতময়ী—অমৃত-রূপিণী। যেমন দেবতা—তেমনি দেবী। মণি-কাঞ্চন সংযোগ—হরগৌরী মিলন। ধন্য গোপালদা, ধন্য তোমার জীবন! আর ধন্য তুমি দেবী, ধন্য তোমার ধরায় অবতরণ।'

নয়ন কহিল, 'ঠাকুরপো, আমার রান্না হয়েছে, শীগ্‌গির স্নান ক'রে দু'টো খেয়ে যাও। অনেকদিন তোমাদের দুই ভাইকে একসঙ্গে খাওয়াইনি। তবে তরকারি-পাতি তেমন নেই ভাই, দেখছ-ইতো গাঁয়ের দশা। কিছু কি কিনবার যো আছে আর।'

গোপাল সহাস্যে কহিল, 'তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাকরুণ থাকতে গাঁয়ের দশা যে কেন এমন হলো বৌদি, কিছুই বুঝতে পারি না। সবই আমাদের ভাগ্য।'

নয়নবৌ ভীতকণ্ঠে কহিল, 'তাইতো ঠাকুরপো, লোকপুর এমন সোনার গাঁ, পৃথিবীর মধ্যে যেন ইন্দ্রপুরী, তার এমন দশা! বেশী দিনের কথা নয়—পাঁচ সাত বছরের মধ্যে কেন এমন হলো ঠাকুরপো? কথায় বলে, 'রেতে কা-কা, দিবা শিবা' রেতে কাকের ডাক আর দিনে শিয়ালের ডাক যে গাঁয়ের প্রহরী, সে গাঁ সত্বর শ্মশান হয়ে পড়ে—সে গাঁয়ে বাস করতে নেই।'

প্রবোধ সজোরে কহিল, 'তুমি কল্যাণময়ী পল্লী-লক্ষ্মী। তুমি থাকতে গাঁ কখন মরবে না—লোকপুর আবার লোকে ভরপুর হবে। লোকপুর আমাদের জন্মভূমি—আবার লোকপুর বাঁচবে—আবার জাগবে—আবার ধন-ধান্যে পূর্ণ হবে।'

বিষণ্ণ বদনে নয়নবৌ কহিল, 'তা তো হবে, কিন্তু তোমরা গাঁ ছেড়ে গেলে লোকপুরকে কে বাঁচাবে—কে জাগাবে? যে ক'টা লোক গাঁয়ে আছে তারা কতকগুলো মরা, বাকিগুলো শিয়াল কুকুর। যদি গাঁকে বাঁচাতে চাও, তোমরা কজন গাঁয়ের ছেলে বিদেশ ছেড়ে দেশে এসো। জীবন্ত মানুষ যে ক'জন, তারা টাকার লোভে—আপনার স্বার্থ, সুখের লোভে—বিদেশে বাস করলে গাঁ কখনও বাঁচবে না। দূর থেকে মুখের চীৎকার কল্লে মরা দেশ জাগবেও না—বাঁচবেও না। গাঁয়ে-ঘরে এসে দেশের জন্য হাতে-কলমে কাজ করতে হবে, কাজ করাতে হবে। খালি মুখে 'ম্যালেরিয়া' 'ম্যালেরিয়া' করলে কোন ফল ফলবে না।'

প্রবোধ কহিল, 'তা বটে বৌদি। প্রাণে শক্তি নেই, তাই প্রাণের কান্না মুখে কাঁদি। মহাশত্রু ম্যালেরিয়াই-তো দেশটাকে খেলে। তাকে কি ক'রে মারি, সেই চিন্তায় পাগলের মত পথে ঘাটে কাঁদি! জেগে কাঁদি—ঘুমিয়ে কাঁদি—দেশে কাঁদি—বিদেশেও কাঁদি।'

নয়ন কহিল, 'কেবল এক ম্যালেরিয়াকে মারলে হবে না ঠাকুরপো। জঙ্গল সাফ করে—এঁদো ডোবা ভরাট করে, পেঁকো-পুকুর পরিষ্কার করে, মশা মেরে যেমন ম্যালেরিয়ার বীজ মারতে হবে, তেমনি আর একটা বড় শত্রুর জড়কেও মারতে হবে।'

প্রবোধ···আর তেমন বড় শত্রু কি বৌদি?

নয়ন...সব চেয়ে বড় শত্রু অনাহার। দুর্ব্বল দেহের ঘাড়েই ম্যালেরিয়ার বেশী অধিকার, অনাহারের গোড়া হচ্চে পয়সার অভাব। দেশের যে দশা দাঁড়িয়েছে, তাতে গোলামীতে আর পয়সা হচ্ছে না। দেখতেই পাচ্ছ, বি-এ এম-এ পাশ ক'রে পঁচিশ ত্রিশ টাকার চাকরী মিলছে না। পাশ করাতে যে খরচ হয়, তাতে ছেলেকে ব্যবসা করবার পুঁজি বেশ করে দেওয়া যায়—এ মোটা কথাটা এখন খুব মোটা বুদ্ধির লোকেও বুঝতে শিখেছে। জিনিস পত্রের যে দাম চড়েছে, তাতে আগেকার চার পাঁচ গুণ খরচে এখন অতি কষ্টে ভাত কাপড়টা মেলে। তার উপর একটা মহাগ্রহ—মেয়ে। তার বিয়ে, বেহাই বেহানের বাড়ী তত্ত্ব-তল্লাস, তার ওপর উপগ্রহ—ডাক্তার

কুইনাইন, সাগু বেদানা। এ সব ছাড়া নিত্য দেবসেবা—চা বিস্কুট পান সিগারেট ইত্যাদি উপকরণ আছে, সকলের ওপর উপসর্গ—ঘড়ি, ছড়ি, জামা, জুতা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকলের ওপর আবার রকমারি ভোগবিলাস আছে—অন্দরে, বাইরে, কাণে নাম শুনেছি, চোখেও দেখিনি—মনেও রাখতে পারিনি। নানারকমের নানা উপদ্রবে এখন এ দেশের জীবনটা এতো ভারী—এতো বিড়ম্বনার বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বাঙালির দেহের চেয়ে বিড়াল কুকুরের শরীর স্বর্গের সামগ্রী বলে বোধ হয়। আর দু'দিন পরে খালি ভাত খেয়ে প্রাণ রাখা দায় হয়ে দাঁড়াবে।'

এমন অনেক কথাই নয়নবৌ'র গলিত কণ্ঠস্বর হইতে বীণারবে গোপাল ও প্রবোধের শ্রবণে সুধাধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। উভয়ে অনিমেষ নয়নে গৃহলক্ষ্মীর মুখপানে চাহিয়া মুগ্ধ প্রাণে স্বর্গের সুধাধারা পান করিতে লাগিল। প্রবোধ ব্যাকুল কণ্ঠে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'বৌ-ঠাকরুণ, তুমি সাক্ষাৎ দেবী অন্নপূর্ণা। বল তো, এ দেশে এ দারুণ অন্ন-সমস্যার উপায় কি?'

নয়ন কহিল, 'মহাজনরা যা বলেছেন তাই এখন পন্থা, আর কিছুই নয়। আর্য্যাবর্ত্তের ধর্ম্মক্ষেত্রে—ধর্ম্ম-পথই পথ। সে পথের গতি—সোজা চাল-চলন আর উঁচু ভজন-সাধন। এই বলিয়া নয়ন একটু মধুর হাসি হাসিয়া কহিল, 'তোমরা আজকাল যাকে বলছ—(plain living high thinking)

তাহ'লে মনে প্রাণে গোলামী ছাড়তে হবে—বিদেশী জিনিস খাবে না—ছোঁবে না। ভগবানের শ্রীমুখের বাণী জীবনের মূলমন্ত্র বলে সত্যাগ্রহে জড়িয়ে ধরতে হবে ;—

যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

প্রত্যেককে এইরূপ সাধক, কর্ম্মযোগী হতে হবে। যারা যারা দেশকে বাঁচাতে, জাগাতে চায়, তাদের সহরের মোটা টাকার গোলামী ছেড়ে দেশের ঘরবাড়ীতে এসে বসবাস করতে হবে, দেশের চাষ বাসের উন্নতি করতে হবে। মাঠের জমীতে নিজের হাতে ধান, ছোলা, কলাই, সরষে বুনতে হবে, বাড়ীর বাগানে কলা, বেগুন, পেঁপে আলু আজাতে হবে—তার সঙ্গে সব বাড়ীতেই বেশী পরিমাণে কাপাস গাছ রুইতে আর ঘরে গরু পুষতে হবে। আপনি মাঠে বেড়িয়ে গরু চরাতে লজ্জা বোধ করলে চলবে না। দেশের চাষাদের যৌথ কারবারে উৎপন্ন শস্যাদির ব্যবসাই প্রাণপণে চালাবার চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেক পুরুষকে লোহার মানুষ হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্দরে মেয়েদের ঠিক তেমনি ছাঁচে গড়ে তুলতে হবে। খালি গাল-গল্প আর বৃথা চর্চ্চা ক'রে এখনকার মত তারা কুড়েমী ক'রে কাল কাটাতে না পারে। কথাটা সকল সময় প্রাণে জপতে হবে—heaven helps those who help themselves।

প্রবোধ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিল, সে চিত্ত-বিনোদিনী মনপ্রাণ বিমোহিনী চির মধুর হাস্যময়ী বৌ'দি আর নাই; নয়নের

সুধা-অঞ্জন-স্বরূপিণী নয়নবৌ আর নাই। তাহার স্থলে এক অপূর্ব্ব দিব্য কান্তি স্বর্গের অনল-শিখা, বাংলার পাপ-তাপ বিদগ্ধ করিবার জন্য ধরায় অবতীর্ণ হইয়া দাউ দাউ জ্বলিতেছে!

প্রবোধ উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে আপন মনে আপনি কহিল, "এ পাপ তাপের বাঙালী-সংসারে যদি কেউ সুখী, সৌভাগ্যবান্ থাকে, তবে এমন রমণী-রত্ন যার ঘরে সেই একমাত্র জন। গোপাল, তুমি ধন্য—তোমার গৃহ যথার্থই পবিত্র স্বর্গ।'

খাওয়াইবার জন্য প্রবোধকে লইয়া নয়ন প্রস্থান করিল, গোপাল উদাস প্রাণে কত কি ভাবিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'গোপাল, ভাই, একখানা চিঠি আমায় লিখে দেবে?'

গোপাল ব্যস্ত-চক্ষে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় রজনী দিদি?'

রজনী, নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে গোপালের মুখপানে চাহিয়া কহিল, 'সে অনেক কথার কথা ভাই। রায়-গাঁ জানই তো কি দুষ্ট জায়গা?'

গোপাল বোধ হয় রজনীর মুখে সবে এই প্রথম 'রায় গাঁ'র নাম শুনিল। রজনীকে সে ভালরূপই জানিত, তাই রায়-গাঁ'র

কথায় বেশী বাড়াবাড়ি না করিয়া কেবল জিজ্ঞাসা করিল, 'তার পর?'

রজনী বহ্বাড়ম্বরে কহিল, 'তার পর আর কি বলব আমার মাথা মুণ্ডু! হতভাগাটা মরে গেল—ছারে-গোল্লায় গেল—আমায় জন্মের মত খেয়ে গেল! যদি মরবার আগে বিষয়টা বেচে আমার হাতে নগদ টাকাগুলো দিয়ে যেতো কি একখানা কাগজ ক'রে যেতো, তা' হলে আমায় এত ভোগ ভুগতে হতো না। অনায়াসে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে দু'টো খেতে পেতাম। হতভাগার গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে, বছর বছর ছেরাদ্ধ-শান্তি করে, প্রেতযোনি থেকে উদ্ধার করতাম। মরুক মরুক—এখন গাছে গাছে ঘুরে ঘুরে মরুক।'

গোপাল বুঝিল যে, বিধবা রজনী মৃত স্বামীর উদ্দেশে ঐ সকল বিশেষণের ব্যবস্থা করিতেছে। বিধবা পত্নীর পরিণামের জন্য অর্থসঞ্চয় না করিয়া, স্বামী যে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চিরন্তরে প্রস্থান করিয়াছে, সেই অভিমানে ক্রোধে রজনী আত্মহারা হইয়া, যখন তখন যাহার তাহার কাছে শ্বশুরের সপ্তম কুল পর্য্যন্ত অভিশপ্ত করিয়া থাকে। এইরূপ স্বামী-তর্পণের মন্ত্র আওড়াইতে আরম্ভ করিলে, গোপাল প্রবোধ-বাক্যে অনেক বুঝাইয়া রজনীকে প্রশান্ত করিল। রজনী উচ্চ কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া যেন আপন মনে কহিতে লাগিল, 'বিদ্যেসাগর বড় ভাল পথই বার করেছিল, দেশের হতভাগা লোকগুলো তা বুঝলে না! নইলে আজ আমার

ভাবনাটা কি?' 'আমার' কথাটা বলিবার সময় রজনী বিকট ভঙ্গীতে গোপালের পানে তীব্র কটাক্ষপাত করিল। সে কটাক্ষের অর্থ গোপাল বুঝিল না, অথবা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিল না। গোপাল প্রবোধ-ভাবে কহিল; 'রজনী-দিদি, মিছে আর রাগ-অভিমান করে আপনাকে কষ্ট দিয়ে ফল কি? মরণ জীবন তো ভগবানের হাত। সে বেচারী কি ইচ্ছে করে প্রাণটাকে ঘুচিয়েছে? তোমায় সুখী করতে কি তোমায় নিয়ে ঘর সংসার করতে কি তার প্রাণে সাধ ছিল না? কি করবে, সে হতভাগ্য— তোমার অদৃষ্টে স্বামীর সংসার নেই, নইলে অমন বয়সে সে মরবে কেন?'

রজনী সদর্পে কহিল, 'মরেছে, আপদ গ্যাছে, সেজন্য কোন দুঃখ নেই। বলিয়া রজনী আবার এক বিকট কটাক্ষে গোপালের মুখপানে চাহিল। গোপাল এবারে সে কটাক্ষের অর্থ সুস্পষ্ট বুঝিল—রজনীর হাব ভাবে চমকিত হইল! সে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার চিঠি কি এখন লিখতে হবে?'

রজনী কহিল, 'না, তত তাড়াতাড়ি নেই। সন্ধ্যের পর তোমার সময় হবে? একবার আমাদের বাড়ী যেতে পারবে?'

গোপাল অন্যমনস্কভাবে কহিল, 'সন্ধ্যার পর? কেন, এখন লিখে দিই না কেন?'

রজনী সহাস্যে আবার সেই বিকট কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, 'না, এখন না, একটা কথা আছে।' আধ-আধ

ভাবে কথা কয়টি বলিয়া রজনী হেঁটমুখে মাটীর পানে চাহিয়া—পায়ের আঙ্গুলে দাগ দিতে লাগিল। রজনীর দুষ্ট অভিপ্রায় গোপাল সম্যক্ বুঝিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল, 'কি কথা? আমার সঙ্গে তোমার কি কথা?' রজনী ঈষৎ হাসিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিল, 'সে মনের কথা—আমি মনে মনে বলেছি, তুমি মনে মনে বুঝেছ। বুঝে আবার ন্যাকামি করছ কেন?' বলিয়া দুষ্টা রজনী দুষ্ট-হাসি হাসিল। গোপাল সদর্পে কহিল, 'আমি তোমার মনের কথা বুঝ্‌তে পারিনি—বুঝ্‌তে চাইও না। তুমি এমন কথা আর বল্‌লে আমি হারুদাদাকে সব বলে দেব।' তীব্র কণ্ঠে কথা কয়টা কহিয়া গোপাল দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রজনী দলিতা-ফণিণীর ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইল! রজনী প্রাণের মধ্যে প্রাণের ভাষে কহিল, 'এর ঠিক শোধ নিতে পারি তবে এ জীবন রাখব, নইলে তোমার কথার মত আগুনে এ ফাঁকা অসাড় জীবনটাকে দগ্ধে দগ্ধে মারব।'

আপন মনে বকিতে বকিতে রজনী মৃতপ্রায় অসাড় দেহটাকে বহিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মেয়ে খুব বাড়ন্ত। বয়সও বার পার হইয়া তেরোয় পড়িল। গাঁয়ের লোক ঘাটে পথে বলাবলি করিতে লাগিল—বুড়া বুড়ীরা বলিতে আরম্ভ করিল—'এখনকার ওসব সাহেবী চালচলন। বাপ পিতাম'র পিণ্ডিতে ছাই পড়ুক—লোকে যা ইচ্ছে বলুক, মেয়ের বে' কিছুতেই দেবো না, তাতে জাত জন্ম থাক, আর যাক্। আর কি সমাজ আছে, না সমাজে সে সব তেজী লোক আছে? এ সব অন্যায় অনাচার কখনই স্বর্গীয় কর্ত্তারা সহ্য করতো না। আজই গোপাল বোসকে একঘরে করতো, তার ধোপা নাপিত বন্ধ করে দিতো।' এই-রূপ নানাভাবের নানা কথা লোকপুরের ঘাট পথ তোলপাড় করিয়া ফেলিল।

বাংলার পাড়াগাঁ এখন মৃতপ্রায় নীরব নিস্তব্ধ! ধন-ধান্যের প্রাচুর্য্যে, গাহনা-বাজনা খেলা-ধূলায় আমোদ-আহ্লাদে যে সকল গ্রাম সর্ব্বক্ষণ মুখরিত থাকিত, সে সকল পল্লী এখন ম্যালেরিয়ার মড়ক আর অভাব অনাটনের হাহাকারে দিবানিশি মাটীতে মিশিয়া রোদন করিতেছে! বেশী দিন নয়—বেশী দিনের কথা নয়—বিশ বৎসর আগে যে সকল গাঁয়ের আড়ম্বর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মন প্রাণ আনন্দে উৎসাহে আকাশের উর্দ্ধে নাচিয়া উঠিত, সেই সকল বড় বড় গ্রামের বড় বড় বাড়ী এখন

ভাঙ্গিয়া জঙ্গলে পুরিয়াছে! স্যাকড়া-বাঘ, বুনা-শুয়ার আর শিয়ালের আনন্দ-কোলাহলের আখড়া হইয়াছে। এই সকল মৃতকল্প গাঁয়ের ও সমাজের হৃদয় হইতে বড় বড় লোক, ভাল ভাল লোকের চিহ্নও মুছিয়া গিয়াছে। কেবল দুষ্ট ক্রূরমতি কতকগুলা লোক সামাজিক দলাদলি মামলা মোকদ্দমা আর বিবাদ বিসম্বাদের আগুণ জ্বালাইয়া মৃত পল্লীভূমিটাকে এখনও কথঞ্চিৎ জাগাইয়া রাখিয়াছে। এই সকল দুষ্ট প্রকৃতির লোকগুলার মধ্যে লোকপুরের হারু রায় একজন প্রধান ব্যক্তি। হারু রায় বুক ফুলাইয়া সর্ব্বত্র বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, 'সাহেবী চাল করে গোপাল বোস দেশ ছেড়ে চলে যাক্। সমাজের বুকে বসে এমন দাড়ি উপড়ালে কে সইবে? হারু বেঁচে থাকতে লোকপুর এখনও তেমন-মরা নয় যে, যে যা মনে করবে, তাই করবে।' বাংলার পাড়াগাঁয়ে একটা কথা আছে, 'গাঁয় মানে না আপনি মোড়ল।' হারু রায় স্বয়ং সেই প্রচলিত কথাটার এক সমুজ্জ্বল সজীব প্রমাণ। হারু রায় কর্কশ-ভাষী দুষ্ট প্রকৃতি। সে নিতান্ত দরিদ্র—মূর্খ। তাহাকে মানে কে? তবে সে আকাশে লাফাইয়া আপনাকে বড় দেখিত এবং পরের কাছেও আপনাকে তেমনি বড় বলিয়া বড়াই করিয়া বেড়াইত। তাহার কথায় চতুর লোকে মুখ টিপিয়া হাসিত আর নির্ব্বোধ আহাম্মুখ—প্রতিদ্বন্দ্বী সাজিয়া আস্ফালনে হারু রায়ের সহিত বৃথা গলাবাজি করিত। রজনী, হারু রায়ের বিধবা ভগ্নী, তাহার সংসারেই থাকে। সে বয়সে

হারুর ছোট, কিন্তু গলাবাজিতে হয়কে নয় করিতে, নিরীহ নির্দ্দোষ গরীরেব জাতি নাশ করিতে, সতীর কুৎসা কলঙ্ক রটাইতে, দাদা অপেক্ষা অনেক বড় ভিন্ন ছোট কোন অংশেই নয়। গোপাল বসুর কন্যার বয়োবৃদ্ধির জন্য হারু রায় যেমন যেখানে সেখানে পুরুষ সমাজে নানা কথা নানা ভাবে রটাইয়া কুৎসার আগুণ জ্বালাইতে লাগিল, তাহার ভগ্নী রজনীও মেয়ে-মহলে তেমনি কেলেঙ্কারীর বিকট হলাহল ছড়াইয়া জলন্ত আগুণে ঘৃতাহুতি প্রদান করিল।

একদিন জলের ঘাটে দশটা মেয়ের মাঝে রজনী, গোপাল বসুর পত্নী নয়নমণিকে প্রথমতঃ মিঠাকড়া ভৎর্সনায়, পরে বিকট গালি-গালাজে, অবশেষে উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে অভিসম্পাতে অভিনন্দিত করিল। রজনী কাঁদিতে লাগিল,—'ঘাটে তোমরা এতগুলো মেয়ে আছ, তোমরা দশে ধর্ম্মে বিচার ক'রে বল। বল তোমরা কার দোষ? কলিকাল! একালে কারু ভাল করতে নেই। কাকেও ভাল কথা বলতে নেই। আমি তোমার ভালর জন্যই বল্লাম—এত বড় আইবুড়ো মেয়ে ঘরে রেখে মুখে ভাত উঠছে কি ক'রে—এই তো কথা! এই কথায় আমায় গালমন্দ শাঁপাসাঁপি! তা কর্—তোর যা' মনে আছে—তাই কর্—তাই বল্। আমি মাটির মানুষ—আমার শরীরে সব সয়—আমি সব সইলাম। মাথার উপরে ভগবান্ আছেন। তাঁর ধর্ম্মের রাজ্যে এখনও চন্দর-সূয্যি উঠ্‌ছে—এখনও দিন রাত হচ্ছে—তিনি কখন সইবেন না। তিনি অবিশ্যি এর

বিচার করবেন। একদিন না একদিন এর ফল ফলবেই ফল্‌বে।'

গোপাল বসুর পত্নী নয়নমণি পরমা সুন্দরী। নয়নের শরৎ-শশী সম সুন্দর মুখখানিতে মৃদু-মধুর হাস্য-রেখা ক্রোধ বা বিষাদ-কালিমার ছায়া-সম্পাত এ পর্য্যন্ত লোকপুরের কেহ কখন দেখিতে পায় নাই। মেয়ে পুরুষ, ছোট বড় সকলেরই মাতৃস্থানীয়া মমতাময়ী নয়নমণি গোপাল বসুর হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী। অন্তরাত্মার পরম পবিত্র নিভৃত নিকেতনে প্রতিষ্ঠিতা সেই আরাধ্যা দেবীকে লাভ করিয়া গোপাল জীবনটাকে এতই সার্থক এমনই কৃতার্থ বলিয়া মনে করে যে, বিশাল জগতের মধ্যে এমন কোন জিনিস সে দেখিতে পায় না, যাহার অভাবে এত বড় প্রাণটার কোন স্থান তিল পরিমাণ খালি থাকিতে পারে বা থাকিলেও কোন সামগ্রীতে শূন্য স্থানের অভাবটাকে পূরণ করিতে পারে। কি রূপের সৌন্দর্য্যে, কি প্রাণের ঐশ্বর্য্যে, কি মনের মাধুর্য্যে নয়নমণির তুলনা জগতে এক নয়নমণি ছাড়া আর কোথায়? এক নয়নকে পাইয়া গোপাল সংসারের সকলই ছাড়িতে—সকলই ভুলিতে পারে।

ক্রোধের ধারা কিরূপ, বিসম্বাদের প্রবাহ কেমন, তাহা নয়নমণি কখন স্বপ্নেও অনুভব করে নাই।

চিরমধুর-হাস্যময়ী নয়ন, উগ্রচণ্ডা রজনীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। হঠাৎ ব্যাঘ্রের সম্মুখে পড়িলে কুরঙ্গিনী যেমন ভীত ত্রস্ত হয়, নয়নের দশাও তেমনি

হইল। নয়ন প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলনা। হঠাৎ কিরূপে কালভুজঙ্গিনীর মস্তকে পদক্ষেপ করিল, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া নয়ন বজ্রাহতের মত অসাড় মড়ার ন্যায় পড়িয়া রহিল। তাহার নিতুই-নব মুখখানির সৌন্দর্য্যরাশি, মরুমাঝে নিক্ষিপ্ত প্রফুল্ল কমলের ন্যায় নিমিষে নিভিয়া গেল! তাহার চির-মধুর সুধা-ধারা সম হাস্যরেখা বিম্বাধর প্রান্তে লুকাইয়া পড়িল। কত ক্ষণে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া অতি কুণ্ঠিতকণ্ঠে নয়ন কহিল, 'ঠাকুরঝি, আমি জান্‌তে পারিনি, হঠাৎ আমার পায়ের জল ছিট্‌কে পড়েছে। ক্ষমা কর দিদি, পায়ের ধূলো দাও।' এই বলিয়া একটু ব্যঙ্গ ছলে হাসিয়া কহিল, 'জলে দাঁড়িয়ে পায়ের ধূলো দেবে কি ক'রে, একটু পায়ের জল দাও। চরণামৃত খেয়ে পাপ দেহটা পবিত্র করি।'

ঘাটের সকল মেয়ে অবাক হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ী করিতে লাগিল। নয়ন যে রজনীকে কখন কি বলিল, তাহা কেহ শুনিতেও পায় নাই—বুঝিতেও পারে নাই। নয়নের কথা নয়ন নিজেও জানে না—তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাও জানেন না। অথচ ঘাটের মাঝে রজনী এমন একটা তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিল, যাহাতে সমস্ত লোক স্তম্ভিত হইল। রজনীকে গ্রামের সকল মেয়ে পুরুষ সবাই জানিত - সবাই বুঝিত। সে আকাশে ফাঁদ পাতিয়া বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া দেয়, এ কথাটা জানিতে কাহারও বাকি ছিল না। লোকপুরের গ্রামবাসীরা নয়নমণিকে জানিত। ঘাটের মেয়েরা নয়নকে চুপে চুপে বাড়ী যাইতে কহিল।

'রজনী-ঠাকুর ঝি পাগোল' বলিয়া হাসিতে হাসিতে নয়ন তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া গৃহে গমন করিল। রজনীর তর্জ্জন গর্জ্জনে আকাশ পাতাল আলোড়িত হইল। 'আমি পাগোল' অত বড় ধেড়ে মেয়েটাকে ঘরে পুষে যে কাণ্ড কারখানা করছে, তা লোকে জানে না? লোক সব কানা? এর শোধ কেমন ক'রে তুলতে হয়, তা দেখাচ্ছি—রও।' এইরূপ নানা কথা কহিতে কহিতে রজনী বাড়ী আসিয়া হারু দাদার সম্মুখে আছ-ড়াইয়া পড়িল। হারু বুঝিল, তাহার শূর্পনখা ভগিনী—ঘাটে নিশ্চয়ই কোন বিষম কাণ্ড বাধাইয়াছে। রজনী বাল-বিধবা—সুন্দরী হউক না হউক কদাকার নহে। রজনী মাঝে মাঝে বৎসরের মধ্যে দুই একবার কলিকাতায় যাতায়াত করিত। সে যে কোন আত্মীয় স্বজনের বাড়ী যাইয়া থাকিত—তাহা লোক-পুর অঞ্চলের কেহ জানিত না। রজনী গলা বড় করিয়া গ্রামে আসিয়া বলিয়া বেড়াইত—তাহার দেবর হাইকোর্টের একজন বড় উকিল। লোকপুরের লোকেরা তাহার কথা কাণ পাতিয়া শুনিত আর মুখ টিপিয়া হাসিয়া নীরব থাকিত। কলিকাতায় যাতা-য়াতের ফলে রজনী হাতে কিছু টাকা জমাইয়াছিল। সে কারণে আর হারু রায়ের তৃতীয় পক্ষের পত্নী নাবালিকা বলিয়া রজনী হারুর ঘরে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিল। হারু ও রজনী দুই ভাই ভগ্নীর মধ্যে আন্তরিক মায়া মমতা ছিল কি না তাহা তাহারা নিজেরাও অনুভব করিতে পারিত না। বাস্তবিক পক্ষে উভয়ে আপন আপন স্বার্থের বশে পরস্পরের প্রতি স্নেহের ছলনা প্রকাশ করিত।

রজনী হারুর সম্মুখে পড়িয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, 'আজ ঘাটের মাঝে দশ-ধর্ম্মের সামনে নয়নবৌ অপমান করেছে, তার প্রতিশোধ যদি নিতে পার, তবেই দাদা তোমার ঘরে থাকব, নইলে বিষ খেয়ে মরব, নয় তোমার সংসার ছেড়ে যে দিকে দু' চক্ষু যায় সেই দিকেই চলে যাব।'

যদি রজনীর প্রাণের প্রত্যেক শিরা চিরিয়া চিরিয়া পরীক্ষা করিয়া দুনিয়ার কেহ কিছু বিশ্লেষণ করিয়া পাইয়া থাকে, তবে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এক হারু ছাড়া আর কেহ নহে। হারু রজনীর কথা নীরবে শুনিয়া কিছুকাল নীরবে রহিল। নয়ন বৌ কি বলিয়াছে, কেন বলিয়াছে সে সকল কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না—করিবার প্রয়োজনও কিছু বোধ করিল না। কেবল দম্ভভরে গগন ফাটাইয়া কহিল, 'তার যোগাড় আমি করেছি। গোপাল বোস মেয়েটাকে দিয়ে সংসার চালাচ্ছে এ অঞ্চলে এখন কে তা না জানে? সমাজ আর ক'দিন তার এ পাপের অত্যাচার সইবে? মিত্তির-বাড়ী ভোজের দিন তাকে কে রক্ষা করে দেখবো। সে ভোজে সমাজের কোন গাঁ নেমন্তন্নে বাদ পড়বে না। সেই দিনে তাকে বুঝে নোব।'

হারু নানা প্রবোধের ছলে ভগ্নী রজনীকে উঠাইল। হারুর সংসারে পাকশালার প্রধান কার্য্যভার ছিল, রজনীর হাতে। রজনী দাদার কথায় আশ্বস্ত হইয়া ধীরে ধীরে মন্থর গমনে পাক-শালায় গমন করিল।

---

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোপাল বসু লোকপুরের সাধারণ গৃহস্থ ব্যক্তি। তাহার বিষয় সম্পত্তি কিছু আছে, কিন্তু তদুপরি চাকরী না করিলে সচ্ছল ভাবে সংসার চলে না। গোপালের পিতা পাল-চৌধুরীদের নায়েবী করিয়া যাহা কিছু করেন, তাহাতে গোপালকে বি-এ পর্য্যন্ত পড়াইতে সব খরচ হইয়া যায়। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় পড়িলেন, তখন গোপাল কলেজ ছাড়িয়া বাড়ী আসিল, মাতার গহনাপত্রে ও নগদ যাহা কিছু ছিল সব পিতার চিকিৎসায় গোপাল ব্যয় করিল। পুঁজী সবই খরচ হইয়া গেল, অথচ পিতাকেও বাঁচাইতে পারিল না। পিতার মৃত্যুকালে গোপালের মাতা মৃত স্বামীর পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, 'আমি রইতে পারবনি—আমায় শীগ্‌গির ডেকো।' সতীর ক্রন্দন ধর্ম্মরাজের সিংহাসন টলাইল। উপর হইতে গোপালের জননীর 'তলব' আসিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তিন দিনের মধ্যে পত্নীও পরলোক প্রস্থান করিলেন। গোপাল বেশ ব্যয়ভূষণ করিয়া পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিল। গোপাল দেনদার হইল—তাহার ভূমি-ভদ্রাসন বন্ধক দিল।

গোপাল পড়ার আশা ছাড়িল, পত্নী নয়নমণি ও কন্যাকে লইয়া বাড়ীতে বসিয়া সংসার-ধর্ম্ম করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মেয়ের বয়স প্রায় পনের হইল। পিতৃ-মাতৃদায় শেষ

হইলে কন্যাদায়ে গোপাল বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। নানা লোকে নানা কথা নানা ভাবে বলিতে লাগিল। গোপাল আপনার কথা পরের মুখে শুনিয়া মৃতপ্রায় হইয়া ঘরের কোণে অবরুদ্ধ রহিল।

নয়ন আসিয়া নীরবে রহিল। পাছে নিরীহ পতির প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে এই ভাবিয়া ঘাটে রজনীর সহিত তাহার যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহার কিছুই উল্লেখ করিল না। তাহার বিষণ্ণ বদন হইতে মৃদুমধুর হাসির রেখাটুকু যেন চিরতরে বিলুপ্ত হইল। চির-বসন্ত -রূপিণী মাধুর্য্যময়ী নয়নের নিতুই নব ভাবটুকু লুকাইয়া গেল, কিন্তু পতির প্রণয় দৃষ্টিতে তাহা সহজেই ধরা পড়িল। পত্নীগত-প্রাণ গোপাল বুঝিল, ব্যাপার কিছু গুরুতরই ঘটিয়াছে। নতুবা এমন মাধুর্য্যময়ী সৌন্দর্য্যের সায়র—নিমিষে শুকাইল কেন!

রন্ধনের পূর্ব্বে নয়ন স্বামীকে প্রতিদিন 'কি রান্না হইবে' জিজ্ঞাসা করিত। আজ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সে বিরস বদনে একমনে রন্ধন করিতে লাগিল। নয়নমণি সত্যই নয়নমণি। নয়নের বিরস বদন দেখিয়া গোপালের চক্ষে জগৎ সংসার আঁধারময় বোধ হইল। নয়নকে লইয়া গোপাল দরিদ্র সংসারের গুরুভার তূলার মত হাল্‌কা বোধে হাসিমুখে বহিয়া বেড়ায়। এ জীবনে যে ভাবিবার কোন কথা বা অভাবের কোন সামগ্রী আছে বা থাকিতে পারে, ইহা স্বপ্নের ঘোরেও তাহার মনের কোণে উদয় হইবার অবসর পায় না। সে জীবনে

জগতের সবই সহিতে পারে, সবই বহিতে পারে, পারে না কেবল একটা জিনিষ—নয়নের বিষাদ-কালিমাখা মুখখানি। তাহাও এতদিন তাহার সুদীর্ঘ জীবনে—বিবাহের পর প্রায় পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গেল—এতকালের মধ্যে কখনও ঘটে নাই। গোপাল যখনই কোনও দায়ে ঠেকিয়াছে, যখনই কোন ভাবনার স্রোতে ভাসিয়াছে, তখনই নয়ন মাথা পাতিয়া তাহার দায়ের বোঝা—ভাবনার ভার আপনার ঘাড়ে চাপাইয়া স্বামীকে শান্তির শয্যায় শোয়াইয়া রাখিয়াছে। আজ তাহার ভারাক্রান্ত জীবনের দৃঢ় খোঁটা কেন হঠাৎ এমন মচ্‌কাইল? গোপাল অধীর হইয়া উৎ-কণ্ঠিত প্রাণে নয়নের নিকট রান্নাঘরে উপস্থিত হইল। নয়ন তখন শূন্যপ্রাণে একদৃষ্টিতে শূন্য আকাশের পানে চাহিয়াছিল। গোপাল সম্মুখে উপস্থিত হইলে নয়নের উদাস জড়তা ভাঙ্গিয়া গেল, সে পতির মূর্ত্তি আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। স্বামীর উৎকণ্ঠিত ব্যাকুলতা দেখিয়া নয়নেরও সু-গভীর প্রশান্ত প্রাণ বিচলিত হইল। স্বামীর মুখপানে চাহিতে চাহিতে নয়নের নয়ন হইতে দরদরধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। যে দুঃখের প্রতিকার অসম্ভব দুঃসাধ্য, তাহার বিনিময় দরিদ্রের পক্ষে নীরব অশ্রু ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই।

গোপাল কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'কথাটা কি, কি হয়েছে নয়ন?'

নয়ন অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া রুদ্ধ স্বরে কহিল, 'কৈ, না, কিছুই তো হয় নি!' গোপাল কহিল, 'ভূমিকম্প ভিন্ন পর্ব্বত কাঁপে

না। নিশ্চয় কোন গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে। কি হয়েছে বল।'

নয়ন স্বয়ং শান্তি-রূপিণী। বিষাদ বিসম্বাদে সে নিতান্তই নারাজ। আসল কথাটা চাপা দিবার অছিলায় সে বাক্‌জালে বাজে কথা তুলিল। গোপালের মন তাহা মানিল না—গোপাল তাহা বুঝিল না। গোপাল স্বভাবতঃ ধীর প্রকৃতি! তাহার অটল প্রাণ অনায়াসে সকলই সহিতে পারে, কেবল নয়নের সামান্য যন্ত্রণা তাহার বক্ষে শেল বিদ্ধ করে। নয়নের চক্ষে জল তাহার পক্ষে বিষম বজ্রাঘাৎ। সে বজ্রাঘাৎ নিবারণ করিতে গোপাল আপন হাতে হাসিতে হাসিতে আপন হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়—নয়ন তাহা জানিত। তাই সে বুঝিয়া ছিল, ঘাটের ব্যাপার স্বামী জানিতে পারিলে লোকপুর-অঞ্চল প্রলয়ের ঝড়ে প্রকম্পিত হইবে। সে প্রবল-বন্যার বেগ বালির বাঁধে রুদ্ধ হইবে না। নয়ন মৃত পিতা মাতার কথা, শ্বশুর শাশুড়ীর কথা তুলিয়া বিষম প্রলয়ের আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নয়ন যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, গোপালের জেদ ততই বাড়িতে লাগিল। গোপাল দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, 'তোমার ওসব ফাঁকা মুখের ফাঁকা কথা আমি শুনব না, কথাটা কি, তোমায় বল্‌তে হবে। ভূমিকম্প সহজে হয় না! তোমার চখে জল কখনও সহজে আসেনি।'

নয়ন বড় দায়ে ঠেকিল। কথাটা বলিলেও দায়, না বলিলেও দায়। পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় নয়ন স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল,

গোপাল উত্তেজিত হইল। নয়নের জন্য কি—নয়নের কাছেও তাহার জীবনের এমন উত্তেজনা কখনও ঘটে নাই। গোপাল গম্ভীর গর্জ্জনে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া কহিল, 'তোমার চখে জল কে এনেছে, বলতে হবে।'

নয়ন নবনীসম কোমল প্রাণকে দৃঢ় পাষাণে বাঁধিল। সে দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, 'চোখের জল সহজে আসে না, পরেও আনে না'। বড় কষ্টে আপনার কপালের ফলে চ'খে জল আসে।'

গোপাল কহিল, 'হঠাৎ আজ কপালে এমন কি ফল্‌লো যে তোমার চখে জল এলো?' স্বামীর মুখ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া অবনত দৃষ্টিতে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া নয়ন কহিল, 'যতই দিনের পর দিন যাচ্ছে—ততই ঊষার ভাগ্যের ভাবনা জলন্ত আগুনের মত আমার প্রাণের মধ্যে দাউ দাউ জলে উঠছে।' দৃঢ় দেহ দীর্ঘ-বাহু গোপাল—লোহার মত কঠোর কঠিন করিয়া মাথা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'উঁহু উঁহু, তা নয়—তা নয়, কথাটা লুকিও না। আমার কাছে লুকোতে হয় এমন কথা তোমার প্রাণে কিছু নেই —কিছু থাক্‌তে পারে কি?'

নয়ন কহিল, 'তোমার কাছে লুকিয়ে যে জীবনে কথা রাখতে হবে, সে জীবনে তো কোন দরকার দেখি না।'

গোপাল...তবে বল কথাটা কি?

নয়নমণির মুখমণ্ডল জলভরা শ্রাবণের মেঘের মত ভারা-ক্রান্ত হইল। নয়ন অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ভগ্ন কণ্ঠে কহিল, 'ঊষা

হয়েছে আমার বুকের কাঁটা। তার জন্যই দশ জনের দশ কথা শুনতে হচ্ছে।'

গোপাল...হাঁ, সে ত নূতন কথা নয়; আজ দু' তিন বছর থেকে সে কথা শুনছি। আজ নূতন কথা কে কি বল্লে, তাই বল। লুকিও না।

নয়ন ছোট ছোট হাত দু'খানিতে স্বামীর হাত দু'খানি ধরিল। কাতর কণ্ঠে কহিল, 'দেখ, আমার দিব্যি—কথাটা বলবো, কিন্তু কোন গোলমাল করবে না তো? আগে শোন, আমার মাথার দিব্যি, বল, কোন ঝগড়া-ঝাঁটি করবে না?

গোপালের মুখে হাসি আসিল। গোপাল হাসিমুখে কহিল, তুমি যে কাজ বারণ করবে, জগতে আর কেউ আমায় তা' করাতে পারে?'

নয়নের বুকের পাথর নামিল। তাহার অধরপ্রান্তে আবার সেই চির সুধাময় মৃদুহাস্যের প্রভা ফুটিল। হাস্যময়ী নয়ন কহিল, 'দেখ, তোমার ভাব দেখে আমার সময়ে সময়ে বড় ভয় হয়।'

গোপাল বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার ভাবে তোমার ভয় হয়, এমন কোন্ দিন কি ভাব আমার দেখলে।'

নয়ন—জীবনে দু' একদিন যেন দেখেছি। যে দিন হরে-চাষার দুঃখিনী মাকে গাঁয়ের জমিদার সত্যবাবু বিনা অপরাধে মেরেছিলো, সে কাঁদতে কাঁদতে এসে তোমার পায়ের তলে

পড়েছিলো—সেই দিন দেখেছিলাম তোমার ভীষণ মূর্ত্তি, আর একদিন রাধী-ঠাকরুণ মরা-ছেলে কোলে ক'রে কাঁদছিলো, গাঁয়ের লোক ফেলতে বার হয়নি, সেই দিন দেখেছিলাম তোমার করাল মূর্ত্তি! তোমাকে দেখে আমার ভয় হয়েছিল। মনে হয়, সে মূর্ত্তি দেখে স্বয়ং যমেরও ভয় হয়। তাই সব কথা তোমায় বলতে সাহস হয় না।'

গোপাল হাসিতে হাসিতে কহিল, 'তুমি অনায়াসে বলতে পার, কোন ভয় নাই। কি কথা হয়েছে?'

নয়ন কহিল, 'উষার কথা তুলে রজনী-ঠাকুরঝি কত কি বল্লে।'

গোপাল···কি বল্লে?

নয়ন...জাত মারবে, একঘরে করবে, আরও কত ভয় দেখালে।

গোপাল...তাতে তুমি কি বল্লে?

নয়ন...তার কথায় আমি কি বলব? আমি চোরের মত চুপে চুপে চলে এলেম। নিজেরা যখন দোষী—তখন পরকে কি বলব?'

গোপাল সদম্ভে কহিল, 'কেন? নিজেরা দোষী কিসে?'

নয়ন...এত বড় মেয়ে ঘরে, হিন্দুর ঘরে সাজে কি?

গোপাল সগর্ব্বে কহিল, 'ও সব সেকেলের ভাব—সেকেলে কথা ছেড়ে দাও। এখন আর সমাজ খোকা খুকীর বিয়ে দিতে

ভালবাসে না। সেকেলে গৌরী-দান আর আদরের জিনিষ বলে সমাজে চলছে না।

নয়ন হাসিয়া কহিল, 'দেশময় তো ব্রহ্ম-সমাজ বনেনি, ঘরে ঘরে কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রীও জন্মায়নি। বহু হিঁদু বুকে করে এখনও হিঁদুর সমাজ বেঁচে আছে।'

গোপাল যখন বি-এ পড়া ছাড়িয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তখন বাংলার শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব খুব প্রবল হইয়াছিল। 'বিধবা বিবাহ' 'বালিকা বিবাহ' প্রভৃতি প্রশ্ন লইয়া এদেশে শিক্ষিত সমাজে একটা প্রবল আন্দোলনের স্রোত বহিয়াছিল। গোপালও বহু সহতীর্থের সহিত সেই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিল। গোপাল স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গিনীকে আপনার মনের মত করিয়া গড়িবার পক্ষে সাময়িক শিক্ষা দীক্ষা দিতে কিছুমাত্র ক্রটি করে নাই। হিঁদুর মেয়ের স্বাভাবিক সহজাত সংস্কার সহজে ঘুচে না। নয়ন সকল বিষয়ে গোপালের উন্নতিশীল মতের প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ বালিকা বিবাহ, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তাহার প্রাণে আধুনিক সমুন্নত অভিমতের প্রতি একটা বিকট বিদ্বেষ বদ্ধমূল ছিল। গোপাল যখন 'বিধবা বিবাহের' প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহার সহিত আলোচনা করিত, তখন নয়নের আত্মরাত্মা শিহরিয়া উঠিত। কথাটা ভাবিতেও—স্বামীর মৃত্যুর পর আর একটা স্বামী গ্রহণ স্ত্রীলোকের পক্ষে কি বিকট ব্যাপার—

কথাটা ভাবিতেও সতী-সাধ্বী আদর্শ-রূপিণী নয়নের প্রাণ থরথর কাঁপিত।

মেয়েকে বয়স্থা করিয়া বিবাহ দেওয়াও নয়নের পক্ষে ভাল বলিয়া বোধ হয় না। নয়ন কহিল, 'সে তুমি যাই বল, যাই কর, উষাকে আর রাখা ভাল দেখায় না। আমি নিজের চ'খেই ভাল দেখি না, পরে দেখবে কেন? পরে পাঁচ কথা বল্‌তেই পারে।'

গোপাল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, 'বলে আমায় বল্‌বে—আমার সামনে বলবে। তোমায় বলবে এমন মাথা কার ঘাড়ে?'

নয়ন কহিল, 'তুমি আমি কি ভিন্ন? তোমায় কথা বলা আর আমায় বলা একই।'

গোপাল সদর্পে কহিল, 'কি বলব, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়েছি, নইলে কেমন মেয়ে—কেমন হারুরায়ের বোন্ রজনী আজ বুঝে নিতুম।'

কথা কয়টা কাঁপিতে কাঁপিতে কহিয়া গোপাল কাঁপিতে কাঁপিতে বেগে চলিয়া গেল। নয়ন জানিত, গোপালের কথা ও কাজ একই। যখন গোপালের মুখ হইতে একবার বাহির হইয়াছে, তখন আর সে কথা নড়িবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লোকপুর কিছুদিন পূর্ব্বে সে অঞ্চলের খুব বড় গণ্ডগ্রাম ছিল। রাস্তা-ঘাট, বাজার-হাটের খুব জাঁকজমক ছিল। বহু জাতীয় বহু লোক বাস করিত। বহু বড় বড় ব্যবসায়ী, বড় বড় মহাজন, বড় বড় চাকুরে, বহু ধান-ভরা-মরাই, শস্য-বোঝাই গোলা-পালাওয়ালা কৃষক মহাজনগণের কাজ কারবারে লোকপুর বড় সহরের মত সর্ব্বক্ষণ মুখরিত থাকিত।

লোকপুরের সে উন্নতির দিন আর নাই, তাহার সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত! ভীষণ ম্যালেরিয়ার মড়কে লোকপুর মানুষের পরিবর্ত্তে শিয়াল শকুনির আবাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে। অনেক লোক, বহু পরিবার, ঝাড়াকে-ঝাড়ী মারা পড়িয়াছে। বড় বড় বাড়ী জঙ্গলে ছাইয়া ফেলিয়াছে। যাহাদের অবস্থা কিছু ভাল, তাহারা দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় বা অপর কোন সহরে বাস করিতেছে, কতকগুলি বনিয়াদি বাসিন্দা পৈতৃক-বাস্তু মাতৃভূমির মায়ায় বা ভূমি সম্পত্তির লোভে; অপর কতকগুলি বাজে লোক অক্ষমতা ও অভাবের পীড়নে গ্রাম ছাড়িতে পারে নাই। এই সকল অধিবাসীগণের মধ্যে গোপাল বসু প্রথমোক্ত দলের আর হারু রায় শেষোক্ত দলের লোক। গোপাল বসু পিতা, পিতামহের ভূসম্পত্তির মায়ায় আর হারু রায় অক্ষমতা অভাবের পীড়নে গ্রাম ও বাস্তবাটী ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই।

লোকপুরে এখন ভাল লোক প্রায় নাই। যে দুই চারিজন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় মিট্ মিট্ জ্বলিতেছিল, গোপাল

বস্তু তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। অভাবের তাড়নে তথাকার অধিকাংশ লোক প্রায় মন্দমতি—দুষ্টচরিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন রূপে তেমনি গুণে—হীনদেহ ক্ষীণপ্রাণ শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়া, তাহারা শিয়াল শকুনির মত আপনা আপনি খাওয়াখায়ি, মারামারি করিয়া ভারাক্রান্ত জীবনকে বিড়ম্বিত—কণ্টকিত করিয়া অতি কষ্টে শুষ্ক শীর্ণ পরমায়ুকে ক্ষয় করে। কেবল মামলা মোকদ্দমা, বিবাদ বিসম্বাদ বা দলাদলির কথা শুনিলেই তাহাদের অসাড় দেহ, নিৰ্জ্জীব প্রাণ সজীব হইয়া উঠে। সুবিধামত আত্মীয়ের ঘরে চুরি করা বা চোরের সাহায্য করা, পুলিসের মামলা সাজানির পোষকতা করা, আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া—সেই সকল পতিত পাপমতিগণের জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। গাঁজা, চরস আদি নিকৃষ্ট নেশা সেবন তাহাদের জীবনের পরম আনন্দ—চরম উদ্দেশ্য। সামান্য কিছু অর্থ পাইলে তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। দুই চারিটা টাকায় বশীভূত হইয়া তাহারা হাসিতে হাসিতে সাধু সজ্জনের জাত মারিতে—কুলবতীর কুল কলঙ্কিত করিতে—নিরীহ ব্যক্তির হাতে মাথা কাটিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পোষা পালিত কুকুরের মত হারু রায়ের বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। রজনীর রূপ যৌবন অর্থ ও ভাবভঙ্গী তাহার একটা প্রধান কারণ।

ঘাটের মাঝে নয়নবৌকে বিনা কারণে অনেক কথা শুনাইয়া—পদ্মফুলে বজ্রাঘাৎ করিয়া—রজনী বাড়ী আসিয়া, ভাই

হারু রায়ের সহিত পরামর্শ আঁটিতে লাগিল। রজনী কহিল, 'দাদা, তুমি জনা চাটুয্যেকে হাত কর, টাকায় পিছিও না। টাকা আছে—আমি আছি।'

হারু, ভগ্নীর উৎসাহ পাইয়া লোকপুরের বদমায়েস-দলের সর্দ্দার জনা চাটুয্যে ও তাহার দলস্থ অপর পাচ জনকে হাত করিল। রজনী দুই হাতে টাকা ছড়াইতে লাগিল। গোপাল বসুর বিরুদ্ধে সত্বর একটা বিষম বৈরীদল ও ভীষণ ষড়যন্ত্র হইল।

গোপাল কলেজ ছাড়িয়া লোকপুরের কয়টি সুশীল তরুণ বয়স্ক ছাত্রকে লইয়া আপনার বৈঠকখানায় একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। গোপালের চরিত্রগুণে সহৃদতায় ছাত্রগণ তাহাকে যেমন হৃদয় ভরিয়া ভক্তি করিত, তেমনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। তাহারা গোপালের জন্য দুপুর রাত্রে জলে ডুবিতে পিছাইত না। ছাত্রগণের মধ্যে পিতৃহীন ছেলে বিজন অনেক সময় গোপালের বাড়ীতে থাকিত। গ্রাম সম্পর্কে গোপাল তাহার খুড়া। তাই উষা, বিজনকে দাদা বলিয়া ডাকিত। বিজন, উষাকে ছোট বোনের মত স্নেহ করিত। এই পবিত্র স্নেহ মমতাকে বিকট সাজে সাজাইয়া 'হারুর দল' লোকপুরে একটা ভীষণ আন্দোলনের আগুণ জ্বালাইয়া তুলিল। ঘাটে পথে নানাস্থানে জনে জনে নানা ভাবে গোপালের ঘরের কুৎসা কলঙ্কের কথা বাহির করিতে লাগিল। তাহার ফলে নয়নের ও উষার ঘর হইতে বাহির হওয়া বিষম দায় হইয়া উঠিল।

গোপাল সময়ে সময়ে হাসিয়া উষাকে 'দেবকন্যা' বলিয়া ডাকে। দেবকন্যা নরলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে না বলিয়া, গোপাল সময়ে সময়ে কন্যা উষার সহিত ব্যঙ্গালাপ করিয়া থাকে। একেই উষার মুখে সাত-চড়ে কথা নাই, তদুপরি বিজন সম্বন্ধে তাহার প্রাণঘাতী কথার রটনা হওয়ায়, উষা মরমে মরিয়া একেবারে মাটিতে মিশিয়া গেল। গোপালের সুন্দর সুপ্রশস্ত মুখের হাসি, উজ্জল চক্ষের প্রতিভা লুকাইল—তাহার শরীর শুষ্ক, শীর্ণ হইল। যে নয়নকে সম্মুখে দেখিলে, গোপাল হাসিমুখে স্বর্গ-সুখকে পায়ে ঠেলিতে পারিত, সেই নয়ন আজ তাহার শূন্য দৃষ্টিতে মহাশূন্যে ভাসিয়া গেল।

কয়দিন পরে গ্রীষ্মের ছুটিতে স্কুল কলেজ সব বন্ধ হইল। গোপালের প্রাণের বন্ধু প্রবোধ সেই ছুটি উপলক্ষে বাড়ী আসিল। প্রবোধ গোপালের বাল্য-সহচর, সমপাঠী, এক গ্রামবাসী। গোপাল পাড়া ছাড়িয়া নয়নকে হৃদয়ে ধরিয়া অভাবের সংসারে দুঃখের ভাত পরম সুখে খাইতেছিল। প্রবোধও পড়া ছাড়িয়া কলিকাতায় স্কুল-মাষ্টারী করিতেছিল। প্রবোধ বাড়ী আসিয়া, পত্নীর মুখে গোপালের পারিবারিক ব্যাপার শুনিল। গোপালের সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সে গোপালকে ও তাহার স্ত্রী কন্যাকে ভালরূপেই জানিত। গ্রামের দুরাচারগণের ব্যবহারে প্রবোধ প্রাণে বড় ব্যথা পাইল।

প্রবোধ নিদাঘের মেঘের মত মুখখানা বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত

করিয়া গোপালের কাছে আসিল। গভীর কণ্ঠে কহিল, 'কি ঠিক কল্লে? আমি তো বলেছিলেম, গাঁয়ে বসে থেকো না।'

গোপাল মৃত-চক্ষে প্রবোধের মুখপানে কিছুকাল চাহিয়া রহিল—তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। প্রবোধ, গোপালের অসাড় গায়ে ধাক্কা দিয়া কহিল, 'বাজে লোকের কথায় মন খারাপ করো না। ওরা তো কতকগুলা শিয়াল কুকুর, ওদের কথা কে ধরে?'

এতক্ষণে গোপালের অসাড় চেতনা জাগিয়া উঠিল। গোপাল উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, 'এখন কি আর গাঁয়ে মানুষ আছে? গাঁ তে এখন শিয়াল কুকুরে ভরে গেছে। ওদের কথাই এখন কথা, ওদের কাজই কাজ।' প্রবোধ কহিল, 'তা হলে বল, লোকগুর মরে গেছে। এমন মরা-গাঁয়ে থাকতে নাই।' গোপাল কহিল, 'কতকগুলো শিয়াল কুকুরের ভয়ে গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়া তো বড় লজ্জার কথা।'

প্রবোধ সদর্পে কহিল, 'যদি শিয়াল কুকুর বলে তাদের বুঝে থাক, অত ভয় সঙ্কোচ কিসের?'

গোপাল...মিথ্যা ভয়, মিথ্যা সঙ্কোচ তাও জানি, তাও বুঝি। সমাজের কুসংস্কার কু-প্রথা দূর করতে অনেক সদ্গুণ চাই তাও মানি। হিন্দুর প্রাণে কি যে জাতীয় দুর্ব্বলতা—সে অনায়াসে সব সইতে পারে, পারিব রিক গ্লানি কুৎসা সে কিছুতেই সইতে পারে না।

প্রবোধ কহিল, 'তা না পারবে তো আগে সতর্ক হলে না কেন ?'

গোপাল···লোকপুর যে এমন উচ্ছন্ন গেছে তা আগে বুঝতে পারিনি।'

প্রবোধ···যা হবার হয়েছে এখন কর্ত্তব্য কি ঠিক করছ ?

গোপাল...তুমি কি বল ?

প্রবোধ গম্ভীর কণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, 'আমি আগেও বলেছি—আমি মনে করি, এখন এ গ্রাম ত্যাগ করাই উচিত। যদি বল, যে গাঁয়ের কোলে পালিত হয়ে এত বড় হলেম, যে মায়ের মত বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করলে তাকে মরণের দশায় ফেলে আপনার সুখ সাচ্ছন্দ খুঁজতে যাওয়া কি মানুষের কাজ ? তা নয়, কাজটা খুবই মন্দ। মানুষের দেহ ধরে মানুষের জীবন পেয়ে যে দেশের জন্য—জন্মভূমির জন্য কিছু না ক'রে কেবল আপনার ভোগ আপনার ঐশ্বর্য্য নিয়েই চিরজীবন ব্যস্ত থাকে, সে কখনই মানুষ-নামের যোগ্য নয়। মৌমাছি পিঁপড়ে পর্য্যন্ত দশটায় মিলে আপন আপন জায়গার জন্য খাটে, মানুষ হয়ে যে তা বোঝে না, মানে না সে যে মানুষের আকারে ইতর জানোয়ার—এ কথা খুবই মানি—কিন্তু ভাই, দেশ তো আর নেই, দেশ মরে গেছে—কঙ্কাল হয়েছে। সেই কঙ্কাল নিয়ে কতকগুলো ভূত পেত্নী ছেঁড়াছিঁড়ি করছে।

গোপাল কহিল, "কথাটা আমি কোনকালেই মানতে

রাজী নই। এখনও আমাদের পাড়াগাঁয়ে দু'একটা ভাল প্রাণ আছে—তারাই দেশের শক্তি। তাদের নিয়ে গাঁয়ের জন্য খাটতে পাল্লে এখনও মরা দেশকে বাঁচানো যায়। আমিও তাই মনে করেছিলাম আর তাই মনে করেই এত স'য়েও গাঁয়ের কোলেই মাথা দিয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, প্রাণ দিয়ে গাঁকে জাগাবো। গাঁ-গুলো জাগলে, দেশ জাগবে। বাস্তবিক কথাটা খুবই সত্য যে, যে গাঁ সেই দেশ। গাঁ-গুলোকে না জাগালে কখনই দেশ জাগবে না। জাতটা সহরে বাস করে না—জাতটা দেশে গাঁয়ে-ই থাকে।'

প্রবোধ, গোপাল দুই জনেরই দেহে এখনও যৌবনের খুব গরম রক্ত বহিতেছে। এখনও কলেজের গন্ধ তাহাদের ধমনী বহিয়া ছুটিতেছে। সংসারের স্বার্থপরতা বা দেশের আবহাওয়ার জড়তা এখনও তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বাংলার মত মাটিতে মিশাইতে পারে নাই। দেশের জন্য, জাতিটাকে জাগাইবার জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির জীবনে যে একটি বিশেষ দায়ীত্ব আছে—এ কথাটা তাহাদের প্রাণের প্রত্যেক পরমাণুতে অনু প্রাণিত রহিয়াছে। লোকপুর গ্রামে এখনও পর্য্যন্ত আরও কয়জন শিক্ষিত যুবক আছে। তাহাদের মধ্যে কেহ মুনসেফ হইয়া কখন শলদীপে কখন বারিপুরে ঘুরিতেছে, আর বদলি হইবার সময় প্রত্যেকবার হাইকোর্টের সপ্তম পুরুষ অভিশপ্ত করিতেছে। কেহ ওকালতি আরম্ভ করিয়া আদালতের বৃক্ষতলে ঘুরিতেছে আর শূন্য চক্ষে, হতাশ প্রাণে, ম্লান মুখে উনিভারসিটীকে নরকস্থ

করিতেছে। দেশের কথা ভাবিবার বা বুঝিবার জন্ত তাহাদের সময়ও নাই প্রয়োজনও নাই। অবশিষ্ট যে দুই একজন প্রবোধ ঘোষের মত স্কুলমাষ্টারী বা অন্ত কোন কাজ করে, তাহারা ছুটি উপলক্ষে গ্রামে কখন আসিয়া সখের সভা সমিতি করে ও বক্তৃতার গলাবাজীতে ও স্বদেশী-সঙ্গীতে দেশ উদ্ধারের সংদারী প্রহসন অভিনয় করিয়া থাকে—গোপাল ও প্রবোধ তখন তাহাদের মাথা হইয়া দেশের জন্ত কিছু করাইয়া লইবার চেষ্টা করে।

গোপাল ও প্রবোধ মনের আবেগে আপনাদের দেশ গ্রাম সম্বন্ধে কিছুকাল কথাবার্ত্তা—আন্দোলন আলোচনা চালাইল। অবশেষে উঠিবার সময় প্রবোধ উৎসাহভরে কহিল, 'কিছু ভেবো না, কিছু মনে ক'রো না। শীগগির এ ঝড়ো-মেঘ উড়ে যাবে ও আবার ফরসা হবে।'

গোপাল ঈষৎ হাসিয়া কহিল, 'আমায় যে একঘরে করতে চায়।'

'একঘরে না হয় দু'ঘরে হয়ে থাকবে' বলিয়া প্রবোধ হাসি মুখে প্রস্থান করিল।
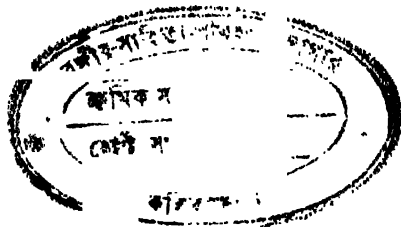
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হারু রায়ের ঘরে একটা খুব-জাঁক-জমকের মজলিস জমিয়াছে। জনা চাটুয্যে, হরি রায়, মতি বোস প্রভৃতি দলবল লইয়া গোপালের গৃহ-পরিবার সম্বন্ধে একটা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে! মতি বসু, গোপালের জ্ঞাতি-শত্রু। গোপালের বাস্তু-ভিটার সহিত গোপালের বাস্তু সংলগ্ন। গোপাল, বিষয় সম্পত্তি টাকা কড়ি সম্বন্ধে চিরদিনই উদাসীন, আবার এক আঙ্গুল জমি, মতি বসুর পাঁজরার হাড়। একটা ভেরাণ্ডার বেড়া, মতি ও গোপালের বাড়ীর বাগান দুইটাকে দুই ভাগ করিয়া রাখিয়াছে। সেই বেড়ার গোড়ার সীমানা লইয়া, কখন আগার সীমানা লইয়া মতি প্রায়ই গোপালের সহিত গোলযোগ বাধাইয়া থাকে। যে দিন মতি দুই চারিটা ভেরেণ্ডার গোড়া গোপালের জমির দিকে এক বা আধ-আঙ্গুল আগাইয়া দেয়, সেই দিনই তাহার সীমানার বিবাদ খুব সজোরে জাগিয়া উঠে; সেই দিন সে লম্ফে-ঝম্ফে ভূমিকম্প করিয়া, চীৎকারে গগন ফাটাইয়া গাঁয়ের পাঁচজন জড় করে। গোপাল যেমন বিষয়-বিরাগী তেমনি বিবাদের বিষম বৈরী। বিবাদ বাধিবার উপক্রম হইলে পাছে মতি স্ত্রী কন্যা সহ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, পাছে কার্য্য-গতিকে কোন প্রকারে কুল-ললনার কিঞ্চিন্মাত্র গ্লানি বা মান সম্ভ্রমের হানি ঘটে, এই আশঙ্কায় জড়সড় হইয়া গোপাল এক পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া

থাকে। মতির কথা নিতান্ত অসহ্য বোধ হইলে, গোপাল ক্ষণিক উত্তেজনার বশে প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হয়, নয়ন দ্রুতপদে আসিয়া তখন গোপালের হাত ধরিয়া টানিয়া গৃহে লইয়া যায়। গাঁয়ের যে পাঁচজন দেখিতে শুনিতে আসে, তাহারা মতির দাপে ভীত হইয়া 'গোপালের সবই অন্যায় অত্যাচার' বলিয়া মতির স্বপক্ষে 'রায়' প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করে। জ্ঞাতি-সম্পর্কে গোপাল মতিকে দাদা বলিয়া ডাকে। ভূমি সম্পত্তি লইয়া এইরূপ বিরোধ হিসাবে ও স্বাভাবিক জ্ঞাতি শত্রুতার হিসাবে মতি বহু-কাল হইতে গোপালের বদ্ধ-বৈরী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে যে কিরূপে গোপালের বিষম অনিষ্ট সাধন করিয়া সেই শত্রুতার শোধ লইবে, তাহাই দিবানিশি চিন্তা করিতেছিল, সেই চিন্তায় সে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল! এমন সময়ে স্বর্ণ সুযোগ সমুপস্থিত! মতি আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল।

জনা চাটুয্যেকে কহিল, 'হরি ঘোষের মায়ের শ্রাদ্ধ খুব জাঁকিয়ে হবে। সমাজ নিমন্ত্রণ করবে, পাঁচ-গাঁয়ের লোক জড় হবে—সেই ভোজে পাত পাড়বার সময় হাটে হাঁড়ি ভাঙবো। ওর ঘরের কথা বার করে হাত ধরে পাতা থেকে উঠিয়ে দেবো।...আমায় বলে বদমায়েস লোক!'

মতি কহিল, 'তাতে ও জব্দ হবে না, কলকাতায় চলে যাবে। ওকে কাণা করে ঘরে পুরে রাখতে হবে—ওর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে জ্বালাতে হবে—তবে মনের রাগ মিটবে।

হারু রায় কহিল, 'সে কি পেরে উঠবে? দেশের সব ছোট লোক ওর হাতে। আবার মহকুমার মেজেষ্টর মফস্বলে এলে আগে ওর খোঁজ করে, ব্যাটার সঙ্গে দেখা ক'রে সব পরামর্শ করে। ওকে মারা-ধরা বড় কঠিন কাজ। 'হুঁ' করতে হাজার লোক ওর পিছু হাজির হয়।'

দলের মধ্যে হরি রায় কিছু ভীরু। সে ভীত কণ্ঠে কহিল, 'ও সব ফোজদারী হাঙ্গামার দরকার নেই। তার ওপর ওকে পারবে না। খয়রাতি চিকিৎসের জোরে দেশের সব ছোট-লোক ওর হাতে।'

হারু কহিল, 'শুধু চিকিচ্ছে নয়, ওষুদ, পথ্য সব খয়রাতি তারপর আপদ বিপদে দেশশুদ্ধ সব লোকের ঘরে সে দাখিল হয়।'

হরি...এধারে দিলটা ভাল, দান ধ্যানও আছে। বরাত গুণে বৌটা আর মেয়েটাও তেমনি হয়েছে।

হরির কথায় মতি বোস তেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিল। গোপালের সুখ্যাতির কথা তাহার প্রাণে বিষের কাঁটার মত বিদ্ধ হয়। মতি হরি রায়ের পানে তীব্র কটাক্ষে চাহিয়া উগ্রকণ্ঠে কহিল, 'তাঁবা তুলসী হাতে ক'রে যখন এর পক্ষে সাক্ষী দেবে, তখন ও সব কথা ব'লো। ক' টাকা ঘুষ খাইয়েছে বল তো?'

হরি ভীতভাবে সঙ্কুচিত কণ্ঠে কহিল, 'না না ভায়া, আমার তামাসার কথাটা বুঝতে পাল্লে না, আমি হতভাগার বুজরুকির কথাটা বলছি। কত রকম ভঙ্গি যে জানে আর কত ভাবই করে,

ধরে সাধ্য কার। আমি বল্লেম এক ভাবে, তুমি কথাটা নিলে আর একভাবে।'

হরি রায়কে দলের সকলে চিনিত। সে অতি ভীরু—অবস্থা অনুসারে ভাব অনায়াসে বদলাইতে পারে বুঝিয়া সকলে মনে মনে হাসিল। জনা চাটুয্যে কহিল, 'তোমার মত লোকের কোন ভাল কাজে থাকতে নেই, ঘরে ঘোমটা দিয়ে' ঘুমোতে হয়।,

হরি রায় নীরবে ভীত-চক্ষে ইহার উহার মুখের পানে চাহিতে লাগিল। তখন জনা চাটুয্যে স্পষ্টই কহিল, 'হরি, তুমি ঘরের ছেলে ঘরে যাও—কোন কথায় থেকো না। হরিকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, জনার্দ্দন কঠোর কণ্ঠে তাড়না করিয়া কহিল, 'যাও যাও, উঠে যাও।'

জনা চাটুয্যের গঞ্জিকা-রক্ত চক্ষু ও কঠোর গর্জ্জনে ভীত হইয়া হরি রায় উঠিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। বেশী দূর সে যাইতে পারিল না, একটু আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল—যাহা শুনিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইল।

জনা কহিল, 'গোপালকে একেবারে শেষ ক'রে দেওয়া যাক! কথায় বলে, রোগের শেষ আর শত্রুর শেষ রাখতে নেই।'

জনার প্রস্তাবে হারু রায়, মতি বসু একটু স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল। হারু কুঞ্চিত কণ্ঠে কহিল, 'কথায় বলে, ধর্ম্মের ঢাক বাতাসে বাজে। যদি একটু সুতোর আগায় বেরিয়ে পড়ে, তবেই সর্ব্বনাশ! হয় ফাঁসি নয় দ্বীপান্তর!'

জনা সদর্পে কহিল, 'শাস্ত্রেই বলে, কাপুরুষের বিড়ম্বনা পায়-

পায়। ভীরু দুর্ব্বল লোক ঘরের কোণে ব'সে পরের পয়জার হজম করে—হাজার ঝাঁটা-লাথী মারলেও তাদের লজ্জা হয় না।'

জনার কথায় হারু উত্তেজিত হইয়া কহিল, 'তা বটে। জয়-ভায়া ঠিক কথাই বলেছ। চোখ বুঁজে আর গর্ত্তে পড়ে ঘুমোলে চলছে না। গোপাল বোসের ভারি বাড়ানি হয়েছে; বাড়ানিটা না ভাঙলে আর চলছে না। কথায় বলে, 'যাক প্রাণ থা'ক মান।' যায় প্রাণ যাবে—একে ঠিক করা চাই-ই।'

মতি কহিল, 'ওকে ধনে-প্রাণে মারতে হবে, তার উপায় কি তাই ভেবে ঠিক কর।'

জনা চাটুয্যে তীব্র হাসি হাসিয়া প্রকাণ্ড লম্বা গোঁপ জোড়াটায় তা'দিতে দিতে কহিল, 'শম্মার মুখ দিয়ে বাজে কথা কোন কালে বের হয়নি। কাজের জোগাড় না ক'রে আমি মুখের কথা বের করি না। বাঁশবেড়ের রেসো-বাগ্দাকে না জানে কে? সে অঞ্চলে সে ডাকাতের সর্দ্দার—গুণ্ডার দলপতি। রেসো আমার মুঠোর মধ্যে। সেদিনে শুনেই সে বল্লে 'দাদা-ঠাকুর, তোমার জন্যে হাসতে হাসতে মাথা দেব, কথা রইলো।'

মতি কহিল, 'শুনলেম, তুমিও সেদিন তাকে খুব বাঁচিয়ে-ছিলে। রেসো রায়গাঁর রায়দের বাড়ী ডাকাতি করে ফিরবার সময় প্রায় ধরা পড়েছিলো—তাকে পিছু পিছু অনেক দূর তাড়িয়ে এনেছিলো। ধরে ধরে—এমন সময় বনের পথ থেকে বেরিয়ে পড়ে তুমি লোকটাকে ক' কোপে শেষ করলে, তাই রেসো বেঁচে গেল।'

জনা সগর্ব্বে কহিল, 'ক' কোপ কি? মানুষের মাথায় কি আর এক কোপের বেশী লাগে, যদি অস্ত্রখানা একটু ধারাল হয়?'

মতি কহিল, "রেসোকে নিয়ে কি করবে?'

জনা কহিল, 'গোপালের বাড়ী ডাকাতি করবো—তাকে ধনে প্রাণে মারবো। ওই শালাই হচ্ছে গাঁয়ের শত্তুর—দেশের শত্তুর।

রজনী একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিল। সে দ্রুত পদে আসিয়া কহিল, 'না না, অতটা নয়। প্রাণে মারতে হবে না। বেশী বাড়াবাড়ী ক'রে শেষটা নিজেদের বিপদ টেনে আনবে। ওর বাড়ীতে ডাকাতি ক'রে কোন ফল ফলবে না, ওর ঘরে কিছু নেই। মিছে কেবল বিপদ ডেকে আনবে।'

জনা চাটুয্যে সদর্পে কহিল, 'যা কিছু ওর ঘরে আছে সব লুটে আনব। অবশেষে আণ্ডা-বাচ্ছা সব এক-গড় ক'রে কেটে রেখে আসবো।'

জনার ভাবে, কথায় ও কণ্ঠস্বরে রজনীর রমণী-প্রাণ থর থর কাঁপিয়া উঠিল। রজনী ভীত কাতর স্বরে কহিল, 'জনা দাদা, অমন কথাটা আর মনেও ভেবো না—মুখেও এনো না। অন্য রকমে সমাজে একঘরে ক'রে—কুৎসা বদনাম ক'রে গোপালকে যাতে জব্দ করতে পার তার চেষ্টা কর—তাতে যত টাকা লাগে, আমি আছি। নইলে, ওসব কুপরামর্শে কুচক্রে আমি নেই।

জনা একটু মুচকি হাসিয়া, রজনীর পানে একটু আড়নয়নে

চাহিয়া কহিল, 'গোপাল শালা যে কি গুণ জানে—চোখে দেখলেই মেয়েমানুষ ভুলে যায়।'

রজনীও তেমনি হাস্যে তেমনি ভঙ্গীতে জনার প্রতি চাহিয়া একটু চুপে চুপে কি কহিল—অপরে তাহা শুনিতে পাইল না। হারু, ভগ্নীর রসভাবে সুবিধা সুযোগ প্রদানের জন্য বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। জনার্দ্দন ও রজনীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া মতি কহিল, 'আমি একটু আসি দাদা।' জনার্দ্দন সদর্পে কহিল, 'ভাল খাবার সময় সব-শালা, আর মাথা দেবার সময় জনা চাটুয্যে, কেমন ?'

মতি কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, 'না দাদা; ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বলছি—মাথার উপর চন্দোর সূয্যি—তুমি যা' বলবে—প্রাণ পণ ক'রে বলছি, তা ক'রতে এক পা পিছোব না।'

জনার্দ্দন কহিল, 'হাঁ, খালি ফাঁকা মুখের কথায় কাজ মিটবে না। আজ রাত-দুপুরে মা শবাসনার মন্দিরে ধর্ম্মঘট করে সব প্রতিজ্ঞে কর্‌তে হবে।'

মতি অত্যন্ত আনন্দভরে কহিল, 'বেশ কথা—শত্রু নিপাত ধর্ম্মেরই কথা। ধর্ম্মেরই কথায়—ধর্ম্মঘটই শাস্তোর বাক্যি;' বলিয়া মতি প্রস্থান করিল। জনার্দ্দন গোপালের কথা তুলিয়া রজনীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লোকপুরে কলেরা আরম্ভ হইল। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বাগ্দীপাড়া। লোকপুরের বাগ্দীপাড়ায় আর হাড়িপাড়ায় এখনও বহু লোকের বাস। নিষ্ঠুর নির্ম্মম সর্ব্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া আজিও এই দুইটা পাড়া কিছুমাত্রও খালি করিতে পারে নাই। এখনও ঐ দুইটা পাড়া লোকজনে মুখরিত। হাজার হাজার হাড়ী বাগ্দী এই দুইটা পাড়ায় জীবিত থাকিয়া লোকপুরকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। গোপাল এই দুই পাড়ার আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রাণ-স্বরূপ। গোপালের পায়ে একটি কাঁটা ফুটিলে তাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

সর্ব্বপ্রকার মহামারী দেশের ইতর-পল্লীতেই মূলশিকড় গাড়ে। কলেরা সর্ব্বাগ্রে বাগ্দীপাড়া আক্রমণ করিল। ভোলা বাগ্দী, বাগ্দী-পাড়ার মাথা; পাড়ার মধ্যে তাহার অবস্থা সকলের অপেক্ষা ভাল। এখন বাগ্দীদের সকলেরই অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। পূর্ব্বের সে দুর্দ্দশা এখন আর তাদের নাই। সে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, কাথা আর অনাহারে শীর্ণ শুষ্ক মুখ আর তাহাদের মধ্যে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, তাহারা এখন কাজের লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর তেমন জন মজুর খাটিয়া আট আনা আনিয়া আগেই ছয় আনার তাড়ি খায় না, অথবা একদিন খাটিয়া পাঁচদিন বসিয়া খরশান

টানিতে টানিতে মিছা গাল-গল্পে কাল কাটায় না। এখন তাহারা দিন-ভোর পরিশ্রম করে। পরের ঘরে মজুরি করে, আপন ঘরে চাস-বাস তরকারি-পাতি করে। উৎপন্ন ফসল নিজেরা সুখে ভোগ করে—অবশিষ্ট অংশ গ্রামের হাটে-বাজারে বিক্রয় করে। তাহাদের খাওয়া পরা চালচলন আর সাবেক রকম ময়লা অপরিষ্কার নাই। বিশেষতঃ রাতে তাঁত চরকা চালাইয়া তাহারা খদ্দরের কাপড়, চাদর, জামা, বিছানা পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত ও উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। শারীরিক খাটুনি খাটিয়া যে সময়টুকু বাঁচাইতে পারে, সেটুকু লেখা পড়ার চর্চ্চায় আনন্দে কাটাইয়া দেয়। যখন কাশীদাসী মহাভারত ও কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ সুর করিয়া পাঠ করিতে করিতে তাহারা রাম যুধিষ্ঠিরের নীতি ধর্ম্ম, লক্ষ্মণ ও ভীমার্জ্জুনের ধৈর্য্য বীর্য্য পরস্পরকে বুঝাইয়া দেয় ও আলোচনা করে, তখন ইহসংসারেই তাহারা স্বর্গসুখ উপভোগ করে। শতমুখে গাঁজা-তাড়ি ও মদের নেশায় নির্ব্বিবাদে হৃদয়ের অনুতাপ উদ্গীরণ করিতে থাকে। এক কথায় পূর্ব্বে তাহারা মানব দেহ, মানবজীবনকে যেমন অতি অসার তুচ্ছ সামগ্রী বোধে অনায়াসে মরণকে বরণ করিতে পারিত, এখন আর তাহা পারে না। এখন হাসিমাখা-স্ত্রী-পুত্রের মুখগুলা লইয়া সুখের সংসারকে খুব দামী বলিয়া অনুভব করিতে শিখিয়াছে। তাহাদের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও শিক্ষা দীক্ষার মূলীভূত কারণ, গোপালের অদম্য উদ্যম ও সহানুভূতি। গোপালের উদ্যোগ যত্ন ও চেষ্টায় লোকপুরের হাড়ি-পাড়াও এখন ভদ্র-পল্লীতে পরিণত

হইয়াছে। এখন তাহাদের মধ্যে অনেকে খবরের কাগজ পড়ে, দেশের কথা সমাজের কথা আলোচনা করে—এমন কি বাংলার বাবুদের মত কংগ্রেসের আন্দোলন লইয়া আপনাদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক করিতে—ছোট মুখে বড় কথা 'বলিতে এখন আর লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করে না। তাহাদের দেখাদেখি পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের ইতর লোকেরাও অনুকরণ করিয়া 'ভদ্র' হইয়া উঠিল দেখিয়া দেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও ব্যবসায়ী—তিলি তাম্বুলি ইত্যাদি ধনী সম্প্রদায় অত্যন্ত কুপিত ও ঈর্ষান্বিত হইয়া গোপাল ও তাহার দলবলকে অভিশপ্ত করিতে আরম্ভ করিল। দেশ ব্যাপিয়া কথা উঠিল, 'কাশী বোসের ছেলে গোপাল বোস দেশটার মাথা খেলে। কুলি-মজুর মিলবে না, আপনাদের মাথায় মোট বইতে হবে। হাতে লাঙ্গলের মুট ধরে চাষবাস করতে হবে।' আরও জাত্যাভিমানী সম্প্রদায় এইরূপ নানা ভাবের নানাকথা বলিয়া—তদুপরি নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়া ইতর শ্রেণীর লোকদিগকে এবং গোপাল, প্রবোধ প্রভৃতির দলকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহারা যখন খুব বেশী রকম পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দুই একজন ছাড়া, প্রবোধ প্রভৃতি যুবকদল দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় পলায়ন করিল। গোপাল অটল অচলভাবে সমান উদ্যমে কাজ চালাইতে লাগিল। তাহার 'নাইট-স্কুল' আরও অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত চলিতে আরম্ভ করিল। তাহার ফলে এই দাঁড়াইল—গোপাল বসু যতই দেশের ভদ্র

লোকদিগের বৈরী ও অপ্রিয় হইতে লাগিল, ততই সে ছোট লোকদিগের প্রাণের দেবতা হইয়া উঠিল। তাঁহারা সত্যই স্বর্গের দেবতা জ্ঞানে গোপালকে প্রাণের পূজা প্রদান করিতে লাগিল। গোপাল যেন তাহাদিগের জন্মদাতা পালন কর্ত্তা পিতা ও গোপালের পত্নী 'নয়নমণি' তাহাদের গর্ভধারিণী জননী হইয়া দাঁড়াইল। হাড়ি-বাগ্দী-পাড়ায় কাহারও ক্ষেতে একটী নূতন বেগুন বা কাহারও কলাগাছে কলা ফলিলে, দেবতা ব্রাহ্মণকে না দিয়া তাহারা নূতন ফলটি লইয়া মহা আনন্দভরে ছুটিয়া সর্ব্বাগ্রে গোপালের ঘরে দিতে আইসে। নয়ন লইতে অনিচ্ছা বা কুণ্ঠা বোধ করিলে তাহারা প্রাণের মধ্যে দারুণ আঘাতের বেদনা অনুভব করে। অগত্যা গোপাল তাহাদের হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ্য দুই হাতে গ্রহণ করিয়া, তাহাদের বুকভরা ভালবাসার প্রতিদান—আশীর্ব্বাদে পরিতৃপ্ত করিত।

ভোলার বাড়ীতে এক ছেলে। ভোলা কয়দিন পূর্ব্বে খুব জাঁক জমকে ছেলের বিবাহ দিয়া নূতন বৌ ঘরে আনিয়া সংসার সার্থক ও জীবন ধন্য করিয়াছে। ভোলার একমাত্র ছেলেকে রাত্রি দুই প্রহরের সময় কলেরা আক্রমণ করিল। ভোলা ছুটিয়া গোপালের বাড়ী আসিল, পাগলের মত বকিয়া, গোল করিয়া গোপালকে ডাকিল। ভোলার গোলে গোপালের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। গোপাল তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া ভোলার মুখে সংবাদ শুনিয়া কহিল, 'ভোলা-দা, তুমি ঘরে যাও, আমি ডাক্তার নিয়ে এখনই যাব।'

গোপাল গ্রামের ডাক্তারকে লইয়া অতি সত্বর ভোলার বাড়ী আসিল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গোপাল ভোলার ছেলেকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়াইতে লাগিল। এ বেলা হইলে বিজন প্রভৃতি কয়টি ছাত্র আসিয়া গোপালকে ছাড়িয়া দিল! তাহার পর ভোলার ছেলের চিকিৎসা শুশ্রূষা চালাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বাগ্দী-পাড়ায় আরও কয় ঘরে কলেরা দেখা দিল। গোপাল ডাক্তার লইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

কলেরার আবির্ভাবে বাগ্দী-পাড়ায় মেয়ে পুরুষ সকলের মুখ শুকাইয়া গেল। গোপালকে দেখিয়া তাহারা মৃত দেহে জীবন লাভ করিল। তাহাদের মনে হইল, যেন কোন স্বর্গের দেবতা তাহাদের বিপদরাশি দুই হাতে তাড়াইবার জন্য নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। গোপাল বহু চেষ্টা করিয়াও সকলকে বাঁচাইতে পারিল না। প্রায় পঁচিশটি রোগীর মধ্যে পাঁচটি মারা পড়িল, অবশিষ্টগুলি যে বাঁচিয়া উঠিল সে কেবল গোপালের যত্ন ও শুশ্রূষার ফলে। ভোলার বড় সাধের একমাত্র ছেলেটি মারা পড়িল। ভোলার স্ত্রী ঘন ঘন মূর্চ্ছিতা হইতে লাগিল, ভোলা পাগলের ন্যায় অধীর হইয়া মাটীতে মাথা খুঁড়িতে লাগিল। বাগ্দী ও হাড়ীপাড়ার উন্নতিকল্পে ভোলা গোপালের দক্ষিণ হস্ত। সেজন্য গোপাল দুপর রাত্রে জলে ডুবিতে বলিলে ভোলা সেই মুহূর্ত্তেই ডুবিয়াছে। গোপাল ভোলার প্রাণের দেবতা। গোপাল ভোলাকে সবলে কোলের মধ্যে ধারণ

করিয়া প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতে লাগিল। গোপাল কহিল, ভোলা-দা, জান'ই তো, জন্ম মৃত্যু সবই ভগবানের হাত। এখানে যতদূর সাধ্য ততদূর চিকিৎসা করানো হ'য়েছে—সেজন্য তোমার দুঃখের কারণ নেই। ভগবানের জিনিষ ভগবান নিলেন এই ভেবে এখন মনকে বুঝাও। ওষুদে ও ডাক্তারে যদি মরণ বন্ধ হতো, তা হলে মহারাণীর ছেলে মরত না। যার যখন সময় ফুরোবে তাকে তখন যেতেই হবে। কালের মুখ থেকে স্বয়ং ভগবানও ফিরিয়ে নিতে পারেন না। মহাভারতে পড়েছ ত, অর্জ্জুনের মত ক্ষমতা মানুষের মধ্যে নেই, আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। সেই অর্জ্জুনের ছেলে—আর ভগবান 'শ্রীকৃষ্ণের' ভাগ্‌নে অভিমন্যুর অকাল-মৃত্যু তো কৈ বন্ধ হলো না!' গোপালের প্রবোধ বাক্যগুলি তড়িৎশক্তির ন্যায় ভোলার মৃতপ্রায়-প্রাণে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সজীব করিয়া তুলিল। গোপালের প্রাণপণ চেষ্টায় বাগ্দী-পাড়া হাড়ি-পাড়া প্রভৃতি ইতর পল্লী হইতে কলেরা বিদূরিত হইল। তথাকার অধিবাসীগণ সুস্থ ও সবল হইয়া গোপালের নিকট চিরঋণী—চিরকৃতজ্ঞ রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

লোকপুরে এক মহাসমারোহের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে! হরিষ ঘোষ তখন তথাকার একজন খুব বড়লোক। হরিষবাবু নানারকম ব্যবসা ও কন্‌ট্রাক্টরী কার্য্য করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার পুরাতন ভাঙ্গা খড়ো-ঘরের যায়গায় এখন প্রকাণ্ড অট্টালিকা মাথা খাড়া করিয়া গগন স্পর্শ করিতেছে। অট্টালিকার বাহির-অংশ ও মধ্যভাগে অতি সুন্দর মার্ব্বেল-প্রস্তুত-মণ্ডিত পূজার দালান। দালানের দুই পার্শ্বে দুই বৈঠকখানা। বৈঠকখানা দুইটি নানা রকমের কৌচ, কেদারা, আয়না, ছবি ইত্যাদিতে পরিশোভিত। পূজার দালানের সম্মুখে অতি প্রকাণ্ড ইষ্টক সিমেণ্ট-বাঁধান অঙ্গন। হাজার-দেড় বা ততোধিক লোক অনায়াসে সে অঙ্গনে বসিয়া ভোজন করিতে পারে। সেই বৃহৎ অঙ্গন আজ বহুলোক পরিপূর্ণ। অঙ্গনের উপরিভাগ নীলবস্ত্র-চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত হইয়াছে! তাহাদের বৈঠকখানার একটিতে বহু প্রাচীন লোক, নানা বর্ণের চিত্র বিচিত্র গালচা-দুলিচা-মোড়া চৌকিতে উপবিষ্ঠ। তাহাদের মধ্যে কতগুলি বিজ্ঞ বৃদ্ধ ব্যক্তি হরিষবাবুকে ঘেরিয়া অযাচিত অমূল্য উপদেশ—পরামর্শ প্রদান করিয়া কর্ম্মকর্ত্তাকে কৃতার্থ করিতেছেন। হরিষবাবুর মাতৃ-শ্রাদ্ধ। মহাসমারোহে দানসাগর

ক্রিয়া! তদুপলক্ষে হরিষবাবু বিদেশে কর্ম্মস্থল হইতে বহুকাল পরে গৃহে আসিয়াছেন।

বিজ্ঞ বৃদ্ধগণের গ্রাম্য-পণ্ডিত প্রসিদ্ধ শিরোমণি মহাশয় কহিলেন, 'হরিষ, ভগবানের কৃপায় তোমার অবস্থা এখন খুবই ভাল। তুমি পিতৃ মাতৃভক্ত অতি সচ্চরিত্র ব্যক্তি। পিতা মাতা লোকের একবারই মরে। সাধু-শাস্ত্রে বলে, 'সকল ঋণ শোধ হয়, মাতৃঋণ শোধ হয় না!' মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে পিণ্ড প্রদানে আর ভূরিভোজন দানে সে মহাঋণের আংশিক পরিশোধ সম্ভব। মাতৃ আশীর্ব্বাদে কমলার কৃপায় তুমি জীবনে সে শুভ সুযোগ লাভে সমর্থ হয়েছ। এমন সুযোগ হেলায় হারিও না বাপু।'

হরিষবাবু সত্যই অতি সৎপাত্র। হরিষবাবু অতি সামান্য অবস্থা হইতে অতি উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছেন! তাঁহার অবস্থা বদলাইয়াছে, কিন্তু মতিগতি চালচলন কিছুমাত্র গরম হয় নাই, একইরূপ নরম আছে। হরিষবাবু চিরদিনই দীনভাবাপন্ন সদাশয় ও বিনীত। শিরোমণি মহাশয়ের কথায় হরিষবাবু বিনীত কণ্ঠে কহিলেন, 'আপনারা মহাত্মা মহাজন। আপনাদের শুভ আশীর্ব্বাদ অবশ্যই সফল হবে। আমি তো এখন বিদেশে—বিদেশবাসী। আপনারা দয়া ক'রে দেখা শুনা করুন, যাতে কাজ হয় তার ব্যবস্থা করুন।

শিরোমণি কহিলেন, 'তোমার মাতাঠাকুরাণী মহা পুণ্যবতী ছিলেন। তাঁর কাজ সুচারুরূপেই সম্পন্ন হবে তাতে আর

সন্দেহ কি? তবে তুমি একটা কাজ কর বাপু।' হরিষবাবু করযোড়ে কহিলেন, 'আজ্ঞা করুন।'

শিরোমণি...'তুমি' দীনু বাঁড়ুয্যেকে একত্র করো। দীনু দেশের অনেক কাজে কর্ত্তৃত্ব করেছে। সে বড়লোকের ছেলে, নিজেও অনেক বড় কাজ করেছে। দীনু তোমার এ বৃহৎ কাজ খুব ভাল ভাবেই সমাধা ক'রে দেবে।'

নারায়ণ রায় গ্রামের বনিয়াদী বংশের লোক। তাঁহাদের বাড়ীতেও পূর্ব্বে বহু বড় বড় কাজ কর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। এখন আর রায়বংশের তেমন অবস্থা নাই—তেমন কাজ কর্ম্মের অনুষ্ঠানও নাই। তাল-পুকুরের তাল আর নাই—আছে মাত্র নাম। রায় মহাশয়দের নাম, মাত্র নামে আছে—কাজে আর কিছুই নাই। বাস্তবিক যখন বনিয়াদি বংশের অর্থগত কার্য্যগত শক্তি বিনষ্ট হয়, তখন তাহার আভিজাত্যের অভিমানটা সতেজে ফুটিয়া উঠে। শিরোমণি মহাশয় রায়দের নাম করিলেন না। দীনু বাঁড়ুয্যেকে বাড়াইয়া বড় করিলেন। তাঁহার কথাটা, গ্রামের বনিয়াদি বংশের লোক নারায়ণ রায়ের প্রাণে বড় বাজিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন, 'কাজ তো করবেন, কিন্তু কাজ হবে কি ক'রে?'

গ্রামের অন্য জনৈক প্রৌঢ় কৈলাস হালদার, নূতন বড়লোক হরিষ ঘোষের মোসাহেবী উমেদারী করিতেছে, সে সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জিয়া কহিল, 'কেন? কাজ হবে না কেন? কে আটক করবে এ কাজ? এ তো যে সে লোকের বাড়ীতে যে সে কাজ

নয়! এ কাজে কে বাধা দিতে পারে—কার বাপের ঘাড়ে ক'টা মাথা?'

নারায়ণ রায় কহিলেন, 'গাঁয়ে যে দলাদলির ঘোঁট উঠেছে, তাতে কাজ যে সুচারু রূপে সমাধা হয়, এমন তো মনে হয় না।'

হরিষবাবু ভীত হইলেন, ভীতকণ্ঠে কহিলেন, 'আমার দুরদৃষ্ট! এমন আমি মহাপাপী, আমার কাজ সহজে সফল হবে কেন?'

শিরোমণি সদর্পে কহিলেন, 'কে বলে দলাদলি? কেন, কি ঘটনা কোথা ঘটেছে যে গাঁয়ে একটা দলাদলি ঘটবে?'

যদু রায়, নারায়ণ রায়ের স্বপক্ষের ও সবংশের লোক। যদু গর্জ্জিয়া কহিল, 'সে দেখে নেবে। যখন ঘটবে, তখন দেখে নেবে সব, কেন—আর কোথা কি ঘটলো।'

শিরোমণি-চতুষ্পাঠীর ছাত্র কয়জন স্ফীত বক্ষে স্ফীত কণ্ঠে কহিল, 'হাঁ হাঁ! দেখা যাবে কে কি করে!'

যদু কহিল, 'দেখার আগে সাবধান হওয়াই ভাল, কৃতীর অর্থনষ্ট আর লোকের মনকষ্ট—কথাটা তো ভাল নয়! এত টাকা খরচ হবে, শেষটা যদি কার্য্য পণ্ড হয়, তবে দুঃখের পরিসীমা থাকবে না।'

হরিষবাবু কাতর কণ্ঠে কহিলেন, 'তবে আপনারা আমায় অনুমতি করুন, আমি গঙ্গাতীরে যে কোন রকমে মায়ের পিণ্ড দান ক'রি।'

শিরোমণি একটু চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিতে ভাবিতে জিজ্ঞাসা কহিলেন, 'কেন। হয়েছে কি, ব্যাপারটা কি এমন

ঘটলো যে, গাঁয়ে এমন সময় একটা দলাদলি বাধবে? কে বাধাবে? হরিষ অতি সজ্জন ব্যক্তি। গাঁয়ের কেন—দেশের যাতে মঙ্গল হয় সে জন্য হরিষ বহু টাকা মুক্ত হস্তে দান করছে। ভগবান তাকে যেমন দিয়েছেন, তেমনি অর্থের সদ্ব্যবহারও সে সর্ব্বক্ষণ করতে প্রস্তুত।'

খোসামুদে কৈলাস হালদার উচ্চৈস্বরে কহিল, 'এই সেদিন সাধারণের রাস্তা মেরামতের জন্য বাবু অনায়াসে পাঁচ হাজার টাকার চেক কেটে দিলেন। গাঁয়ের লাইব্রেরীর জন্য পরশু পাঁচশ টাকার বই কিনতে দিলেন। তা'ছাড়া গোপনে যে কত—সে আর কত মুখে কত বলব? কত অনাথা বিধবার অন্ন বস্ত্র দান করছেন বাবু, তা তো চোখের মাথা খেয়ে ব্যাটা-বেটীরা দেখতে পায় না! এমন পুণ্যাত্মা ব্যক্তির বাড়ীতে এত বড় একটা ক্রিয়া উপলক্ষে যে-ব্যাটা গোলযোগ উপস্থিত করবে, ভগবান নিশ্চয়ই তার মাথায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত করবে।'

শিরোমণি কহিলেন, 'একটু স্থির হও। এখন তোমরা কেউ কোন রকম গোলমাল 'ক'রো না। আমাকে ভিতরি-ভিতরি সব আগে জানতে দাও, আর কোন কথায় এখন প্রয়োজন নাই।' এই বলিয়া শিরোমণি মহাশয়, হরিষবাবুর ডসাড় হাত ধরিয়া সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। অপর সকলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিলেন।

নারায়ণ রায় ও যদু রায় উচ্চৈস্বরে নানা কথার আলোচনা

করিতে করিতে প্রস্থান করিল। হরিষবাবুর উৎফুল্ল ভবন নীরব—নিরানন্দময়।

বাহিরে গরীব লোকেরা দল বাঁধিয়া স্থানে স্থানে আড্ডা করিয়া হরিষবাবুর বাটির শ্রাদ্ধ উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আনন্দ উৎসাহ ভরে কহিল, 'ভারি ঘটা! দান সাগর শ্রাদ্ধের এমন কাণ্ড এদেশে কেউ দেখেনি—শোনেনি। গোরামিস্ত্রি লুচি ভাজবে!' এইরূপ নানাজনে নানা কথা কহিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

লোকপুরের জেলে-ঘাটে মেয়েদের একটা খুব বড় মজলিস্। পশ্চিম-গগনে সূর্য্য হেলিলে গ্রামের অনেক মেয়ে, যুবতী, প্রৌঢ়া বৃদ্ধা কক্ষে কলসী লইয়া—ঘরে কলসী-ভরা জল ফেলিয়া জল আনিতে এই জেলে-ঘাটে আসে। গল্প-গুজবে, পরচর্চ্চায়, পরের কথায় আনন্দ উপভোগই উদ্দেশ্য—জল আনাটা অছিলা। বিশেষতঃ, গ্রামের নূতন বড়লোক হরিষবাবু মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বাড়ী আসা অবধি মেয়েঘাটের মজলিস্ বেশী রকম জমিয়াছে। হরিষবাবুর বাড়ীর বৌ ঝি নানা বেশভূষায়—নানা অলঙ্কারে সাজিয়া সন্ধ্যার আগে এই ঘাটে আসে আর হাত মুখ চোখ

নাড়িয়া নানা ছাঁদে নানা কথা বলে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্বামীর সঙ্গে নানা স্থানে বাসায় বাসায় ঘুরিয়া থাকে—অনেকে বর্ত্তমান বঙ্গের বিলাস-সভ্যতার কেন্দ্র কলিকাতায় বাস করে। তাহাদের মুখের বহু ভাবের বহু কথা শুনিবার জন্য, বহু রকমের ভাবভঙ্গী দেখিবার জন্য লোকপুরের অনেক মেয়ে—যাহারা সচরাচর এ ঘাটে আসে না, তাহারাও আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জেলে-ঘাটে—দেখিতে দেখিতে অনেক মেয়ে উপস্থিত হইল। হরিশবাবুর বাড়ীর অনেক মেয়ে, বউ আসিয়া ঘাটের মেয়ে-মজলিসে যোগদান করিল। অনেক নূতন বৌ, ঝি হাঁ করিয়া তাহাদের বসন ভূষণের বৈচিত্র্য-বাহুল্য দেখিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের স্বামী হাকিম কেহ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কেহ মুন্‌সেফ, কাহার স্বামী উকীল। হাকিমের যাহারা পত্নী, তাহারা হাকিমী-চালচলনে মেজাজ খুব ভারী করিয়া দুই একটা কথার অমূল্য রত্ন নরলোকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যে ভাগ্যবতী পল্লী-রমণীর পানে চাহিয়া তাঁহারা কথা কহিলেন, তাহারা আপনাদিগকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিল। যখন স্বদেশিনী ও বিদেশিনীগণের নানা কথায় মেয়ে-মজলিস ভরপুর জমিয়া উঠিল, তখন মড়ার মত জড়সড় হইয়া স্খলিত চরণে ভগ্নপ্রাণে নয়ন ঘাটে আসিল। ঘাটের একপাশ হইতে জল লইয়া নয়ন সত্বর দ্রুতপদে প্রস্থানের উপক্রম করিলে, রজনী ঘাটে আসিল। রজনী একাই একসহস্র। ঘাটে পৌছিবার

পূর্ব্ব হইতেই সে উচ্চকণ্ঠে কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার উচ্চ কথায় ঘাট তোলপাড় হইয়া উঠিল। তাহার দর্পে ও রবে আর সকলের স্বর ও কথা ডুবিয়া গেল। রজনী গলার স্বর সপ্তমে চড়াইয়া কহিল, 'বড় শুভক্ষণে হরিষ-কাকার বাড়ীতে ধুমধামের ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। এ শ্রাদ্ধে আর এক মহাপাপীর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত হয়ে যাবে।'

হরিষবাবুর বড় বৌ, রজনীকে চিনিতেন। সবজান্তা রজনীকে কেবল লোকপুর নয়, পার্শ্ববর্ত্তী আরও আট দশখানি গ্রামের লোক পর্য্যন্ত ভালরূপেই জানিতেন। ফলে রজনী, নিজ গুণে নিজ শক্তিতে দেশমধ্যে আপনাকে বিলক্ষণ অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। রজনীকে দেশের সকল সৎ-সাধু ব্যক্তি ভয়ও করিত, ঘৃণাও করিত। গ্রামের সাধ্বী রমণীগণ রজনীকে দেখিয়া হাড়ে হাড়ে কাঁপিতেন। বাঘ দেখিলে কুরঙ্গিণী যেমন ভীত চকিত হইয়া উঠে, রজনীর সম্মুখে পড়িলে তাঁহাদের সেই দশা ঘটিয়া দাঁড়ায়। রজনী কি বলিতে কি বলে—কাহার নামে কি কুৎসা কলঙ্কের আপবাদ রটনা করে—এই ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ কাঁপিতেন। হরিষবাবুর বড় বৌ—বড় লোকের বধূ হইলেও মনে মনে রজনীকে ভয় করিতেন। বড় বৌ—বহুদিন পরে দেশের বাড়ীতে আসিয়াছেন। রজনীকে ঘাটে দেখিয়া তিনি তাহাকে মঙ্গলামঙ্গল জিজ্ঞাসা করিবার আগেই রজনী পরের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিল। দেখিয়া বড়বৌ উৎকণ্ঠিত হইলেন, ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কার শ্রাদ্ধ রজনী?'

রজনী কহিল, 'বল্লেম যে, একটা মহাপাপীর শ্রাদ্ধ এই সঙ্গে হবে।'

ঘাটের সকল মেয়ে রজনীর কথায় স্তম্ভিত হইল। তাহারা চকিত নয়নে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ী করিতে লাগিল। বড় বৌ কহিলেন, 'তোমার কথা তো ভাল বুঝতে পাল্লুম না রজনী।'

রজনী উগ্রকণ্ঠে কহিল, 'কেন? লোকে কি জানে না? দেশের কোন লোকটা সে কথা শোনেনি—কোন লোকটা তা' জানে না?' বড় বৌ কহিলেন, 'আমরা তো দেশে থাকি না, দেশের খবর কি করে রাখবো বাছা?' নয়ন আগেই রজনীর ভাব—রজনীর কথার ভাব বুঝিয়াছিল। সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। কুৎসা, পরনিন্দা-প্রিয় রমণীরা রজনীকে উৎসাহ দিয়া কহিল, 'কথাটা খুলেই বলনা, রজনী দিদি! সত্য কথা বলতে ভয় কি?'

রজনী তাহাদের কথায় আরও উৎসাহিত হইয়া কহিল, 'ধর্ম্মের ঢাক বাতাসে বাজে। দশমুখে ধর্ম্ম—দশজনেই বলছে। গোপাল বোসের বাড়ীর কাণ্ড কারখানা—কেলেঙ্কারী কে না জানে? কে না বলছে? তাই তো গাঁয়ে এত গোলমাল উপস্থিত হয়েছে। সকলেই বলছে, 'গোপাল বোসকে একঘরে করতে হবে। তাকে নিয়ে আর সমাজে বসে খাওয়া হবে না।'

রঙ্গিনীদেবী প্রায় রজনীর সমকক্ষা সমজাতীয়া। সে একটু মুচকি হাসি হাসিয়া কহিল, 'তা অত বাড়াবাড়ি কল্লে সমাজ মানবে কেন?'

রজনী উচ্চকণ্ঠে ঘাট তোলপাড় করিয়া কহিল,

'বলবো কি রঙ্গ-দিদি, দিনে দুপুরে ছোঁড়াগুলোকে নিয়ে যে কাণ্ড করে—ছিঃ ছিঃ, ভদ্দর লোকের ঘরে—বামুন কায়েতের ঘরে এমন সর্ব্বনেশে কাজ—গলায় দড়ি! ছিঃ ছিঃ, দেখবে, শ্রাদ্ধ-ভোজের দিনে কি কাণ্ড হয়!'

হরিবাবুর বড় বৌ কথাটা শুনিয়া বড় চিন্তিত হইলেন। তিনি কহিলেন, 'তাই তো রজনী, তোরা পাঁচজন থাকতে সেই দিনে গণ্ডগোল বাধবে? আমরা তো দেশে থাকি না। কত দিন পরে এই ক্রিয়া উপলক্ষ ক'রে দেশে এলেম। ভাবলেম, এমন কাজটা আপন দেশে করাই ভাল। দশটা আপনার লোক নিয়ে আমোদ আহ্লাদ লোক-লৌকতা করা হবে। দেখতে শুনতে সব দিকেই ভাল। তা এমন হলে এখানে কাজ বন্ধ করতে হয়। গাঁয়ের যে এমন কপাল পুড়েছে তা জানলে কি আমারা দেশে আসতেম, না গাঁয়ে এ কাজের উদ্যোগ করতেম। পোড়া লোকে আর সময় পেলে না? আমাদের বাড়ীর কাজের সময় তাদের যত মনের ময়লা জেগে উঠলো!'

রজনী ক্রুদ্ধা ফণিণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া কহিল, 'লোকের দোষটা হ'লো কি? যে দোষী তাকে কিছু বলবে না, নির্দ্দোষীকে নিয়ে টানাটানি! নইলে আর কালটাকে 'কলি' বলবে কেন? হায়রে ধর্ম্ম! কি দশাই দেশের হয়েছে! এমন দেশে কি থাকতে আছে? না না, কখনই না। দেশ ছেড়ে চলে যাবো, আগে কাজটা মিটে যাক। দেখি কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়! তারপর এর ব্যবস্থা করবোই করবো।'

রঙ্গিনী কহিল, 'তা বটেই তো। যার যা মনে আসবে সেই তা করবে, আবার তাদের সঙ্গে—তাদের হাতে খেলে তাতে হিঁদুর জাতজন্ম থাকবে কি করে ?'

সধবা অবস্থায় রজনী বাগ্দী-পাড়ার দুইটা যুবককে লইয়া একবার বহুদিনের জন্য রাস দেখিতে গিয়াছিল। সেই কথা ইঙ্গিত করিয়া তেজস্বিনী মোহিনী দেবী কহিলেন, 'কেন ? কথাটা কি ? গোপাল বোস কি এমন কুকাজটা করেছে ? তার মেয়ে, বউ কি কেউ বেরিয়ে গেছে ? কত লোকের বৌ যে দুলে-বাগ্দী নিয়ে রাস দেখতে যায়—আবার বাইরে গিয়ে রাস-লীলাও করে আসে, তাদের কে কি করে ? কে কি বলে ? যত চোরদায়ে ধরা পড়লো গোপাল বোস আর তার বৌ-টা ! তারা কি না নেহাৎ ভাল মানুষ। দেশের হিত হয় কিসে তাই নিয়ে ঘুরে মরে—তাই তাদের যত শত্রু ! ও, কালের কি ধর্ম্ম !'

রজনী তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সে প্রচণ্ড উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিল, 'তা দেখা যাবে সেদিন কে তাকে রক্ষা করে ! দেশের লোক একসঙ্গে জমবে—সমাজের সব লোকই তো আসবে—বিচারে কি হয়, কি দাঁড়ায় তা দেখা যাবে। কার সাধ্যি, কার ঘাড়ে সাতটা মাথা তাকে রক্ষা করে সেদিন, সেইটে একবার বুঝে নোব।'

হরিষবাবুর বড় বৌ ভীতা হইলেন। তিনি কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিলেন, 'দেখ মা রজনী, তোমাদের হাতে ধরে বলছি, এ

সময়টা আর কেউ কিছু কোরোনা। এবারে আমাদের মুখ চেয়ে সবাই চুপ করে থাকো। আর না হয় বলো, আমরা দেশ ছেড়ে চলে যাই।'

মোহিনী দেবী চিরদিনই ন্যায় ও ধর্মের পক্ষে মুক্তকণ্ঠে কথা কহিয়া থাকেন। অন্যায় অত্যাচার তিনি কোনকালেই নীরবে সহিতে পারেন না। লোকে সেজন্য তাঁহাকে 'কর্কশ-ভাষিনী' বলিয়া আখ্যা দিয়াছে। মোহিনী দেবী বড় গলা করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, 'বেশ তো, দেখা যাবে কে গোপাল বোসের কি করে! আহা, বেচারী দিন রাত মাথা ঘামাচ্ছে. কিসে দেশ ভাল হয়—কি উপায়ে ছোট বড় সবাই সুখে থাকতে পারে। আহা, মানুষ তো নয়, যেন সদানন্দ পুরুষ—স্বর্গের দেবতা। সদাই ঘাড় হেঁট—কত নরম, কত শান্ত! তারই অনিষ্ট চেষ্টা—ওঃ! পদ্মফুলে বজ্রাঘাত! দেশ যে উচ্ছন্ন যাবে। এমন দেশ যে জলে পুড়ে মরুভূমি হয়ে যাবে!'

এই বলিয়া মোহিনী দেবী জল লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ অপর সকলেই একে একে চলিয়া গেলেন। কেবল রজনী—রঙ্গিনীকে লইয়া মতলব ও পরামর্শ আঁটিতে লাগিল। রজনী কহিল, 'তুমি বাড়ীতে ঠিক থেকো। মনে রেখো, রজনী এখনও মরেনি। অন্য লোক টাকা খরচ করবে রজনী একেবারে মরে থাকবে না।'

হরিপুরের কাশীবাবুকে হাত করে, কোথাকার গোপাল বোস একপাশে মরে থাকবে। একশ টাকা কাশী বাবুর হাতে গুঁজে

দিলে—সে-ই সমাজ ঠিক ক'রে নেবে। গরীব হ'লেও এখনও তার বংশ-মর্য্যাদা একেবারে ঢাকেনি, এখনও সমাজের অনেকে তাকে মানে—চেনে।' এই বলিয়া রঙ্গিনীর পানে চাহিয়া একটু কটাক্ষ করিয়া মুচকি হাসি হাসিয়া রজনী কহিল, 'কাশীবাবু আমাদেরই হাতের লোক। প্রায়ই আমার বাড়ী যাওয়া আসা করে।'

রঙ্গিনী কহিল, 'না ভাই, এ বড় অসহ্য-অপমান। প্রাণ থাকতে এ অপমান সইবে না। এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। টাকা লাগে তাতে আমিও পিছোবো না। আমরা নেহাত আজও মরিনি দিদি।'

রঙ্গিনীর স্বামী তেজারতি মহাজনী কারবার করিয়া—লোকে বলে, বিশ পঁচিশ হাজার জমাইয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ

হরিশবাবুর মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছে। সমাজের সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ভদ্রগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, ভুরিভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে. অসংখ্য কাঙালী সমাগত হইয়াছে। কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবীড়, নবদ্বীপ, ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থান হইতে বহু পণ্ডিত বহু শিষ্য লইয়া আসিয়াছেন। বাহির বাটিতে বসিয়া তাঁহারা শাস্ত্রের কথা তুলিয়া পরস্পর

তর্কযুদ্ধে বিভোর—আত্মহারা। বাটীর বাহিরে কাঙালীগণ স্থানে স্থানে দল বাঁধিয়া চীৎকারে গগন ফাটাইতেছে। তম্বিদারগণ নানাভঙ্গীতে নানাস্বরে গান গাহিয়া স্বর্গ হইতে পুষ্প-রথ আনিয়া হরিষবাবুর মৃত জননীকে সশরীরে বৈকুণ্ঠে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। গ্রামের নানা স্থানে নিমন্ত্রণ বাড়ীর অঙ্গনে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বসিয়া ধূমপানসহকারে কত খোস গল্পে মাতিয়া কর্ম্মবাড়ী মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। কর্ম্ম-কর্ত্তা মহাপণ্ডিত বিজ্ঞ-প্রবর শিরোমোণি মহাশয় চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করিতেছেন ও হাস্যবদনে মিষ্ট-বাক্যে সকলকে আপ্যায়িত ও পরিতুষ্ট করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকটে আসিয়া সকলকে সর্ব্বপ্রকার দোষ ত্রুটি ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। কর্ম্মী হরিষবাবু অতি বিনীত ভাবে করযোড়ে শিরোমণি মহাশয়ের পিছু পিছু ঘুরিতেছেন। 'ক্ষমা করবেন, দয়া করে মার্জ্জনা করবেন' বলিয়া সকলের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। যেখানে কতকগুলি লোক একত্র জুটিয়া চুপে চুপে কোন কথা কহিতেছে, সেইখানেই শিরোমণি মহাশয় হরিষবাবুর সহিত দ্রুতপদে অতি ব্যগ্রভাবে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে শান্ত সংযত হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। বাড়ীর পশ্চিমে বড় বড় চালাঘরে বামুন ঠাকুরের দল বাঁকুড়া মানভূম জেলা হইতে আসিয়া লুচি, কচুরি,নানারকমের মিঠাই, সন্দেশ, তরকারি পাক করিতেছে ও সুবিধা সুযোগ বুঝিয়া বাটি-বাটি ঘটি-ঘটি ঘি, ময়দা সরাইবার যোগাড় করিতেছে

ও ধরা পড়িবার ভয়ে ভীত চক্ষে চারিদিকে চাহিতেছে। তাহাদের কেহ কোনরূপ কার্য্যে অবহেলা বা চৌর্য্য অপরাধে ভৎর্সিত কিম্বা অপমানিত হইয়া আপনাদের পুরুষপরম্পরাগত কুলমর্য্যাদার অভিমান করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। ভাণ্ডার ঘর বহু রকমের প্রচুর খাদ্যদ্রব্যে ভরপুর হইয়া, ক্ষুধার্ত্ত ঔদরিকগণের সতৃষ্ণ দৃষ্টি ও লোলুপ রসনা—অতি তীব্র ভাবে আকর্ষণ করিতেছে। হরিষবাবুর বাটি তিন মহলে বিভক্ত। সর্ব্ব পশ্চাতে রন্ধন-মহল। রন্ধন-মহল আজ মহিলাগণের কণ্ঠস্বর ও কথাবার্ত্তায় মুখরিত। পাকশালার মধ্যে পাক-ক্রিয়ায় পরিপক্কা অভিজ্ঞা গৃহিণীগণ বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন পাকে নিরতা। বাহিরে, অঙ্গনে গৃহের দাসী বা গ্রামের 'রেমোর মা' 'হরের মা' জোট বাঁধিয়া কোনো স্থানে বসিয়া মাছ কুটিতেছে—কোথাও তরকারি বানাইতেছে ও গ্রামের বা বাটীর বৌ ঝি দিগের গুণ, ব্যবহার বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মন মুগ্ধ করিতেছে। চারিদিকে গোলমাল। চারিদিকে মহাগোল—'দাও' 'খাও।' বৃষোৎসর্গ দানসাগর প্রভৃতি বিরাট ব্যাপার সমাধা হইলে দু'দিকে বৃহৎ অঙ্গনে ভোজের আয়োজন হইতে লাগিল। এক অঙ্গনে ব্রাহ্মণদিগের অপর অঙ্গনে কায়স্থগণের ভোজন অনুষ্ঠানের পাতা লবণ লইয়া পরিবেশক দল উপস্থিত হইল।

এই সময় নিমন্ত্রিত সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে একটা বিষম গোলমাল আরম্ভ হইল। গোপাল তখন গম্ভীর ভাবে নীরবে এক পার্শ্বে বসিয়াছিল। জনা চাটুয্যে চীৎকার করিয়া কহিতে

লাগিল, 'আপনারা সবাই গোপাল বোসের বাড়ীর কেলেঙ্কারীর কথা শুনেছেন! সে সকল কুচ্ছো-কেলেঙ্কারী এদেশে কে না জানে?'

এই কথা শুনিবামাত্র সমবেত লোকদিগের মধ্যে চারিদিকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ রব উঠিল। শিরোমণি মহাশয় হরিষবাবুকে লইয়া জনার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হরিষবাবু কাতর কণ্ঠে অনুনয় করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'জনার্দ্দন, বাবা, এবারে ক্ষান্ত হও। আমায় দয়া করে ক্ষমা কর। দেখ বাছা, আমি দেশে থাকিনা। মনে করে দেখ, তিনি তোমাদের কত ভালবাসতেন—কত যত্ন করতেন। তাঁর নাম স্মরণ করে, আমার পানে চেয়ে আজকের দিনটা স্থির হও।'

চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী। জনার্দ্দন আহত ভল্লুকের মত গর্জ্জন করিতে করিতে কহিল, 'ওসব কথা কে শুনবে? ওসকল কথা আপনি রেখে দিন। কেন? আপনাকে তো পূর্ব্বেই বলা হয়েছিল—আগেই আপনাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। আপনি কৈ আমাদের কথা শুনলেন, কৈ দশজনের মান রাখলেন? জেনেছিলেন-ই-তো, গোপাল বোসকে নিমন্ত্রণ ক'র্লে একটা ভয়ানক গোলযোগ বাঁধবে।'

গোপাল একপার্শ্বে বসিয়া নীরবে শুনিতেছিল, তাহার পার্শ্বে কয়জন নব্য যুবক বসিয়াছিল। তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ

কহিল, 'না, আর সইতে পারা যায় না, এ বড় অসহ্য ব্যাপার। ছোট মুখে এত বড় কথা সইতে পারা যায় না।'

গোপাল তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য কহিল, 'দেখ, একটা মোটা কথায় বলে—'পাগোলে কি না বলে, মাতালে কিনা খায়।' ও কি আর একটা মানুষ বলে গ্রাহ্য—ওর কথা কে শোনে—কে গ্রাহ্য করে? আজ হরিষবাবুর বাড়ীতে মহা সমারোহে কাজ। এ কাজে কোনরূপ বাধা হলে তাঁর কষ্টের সীমা থাকবে না।'

গোপালের কথায় যুবকদল শান্ত হইল। শিরোমণি মহাশয়, দলাদলির কথা শুনিয়া একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, 'জনা, দেখ, তোকে বলি—বেশী কথা তুই বলিস না। খেতে এসেছিস্, চুপে চুপে খেয়ে চলে যা।'

জনা চীৎকারে গগন ফাটাইয়া কহিল, 'কেন, আমরা কি ভিখিরি বামুন যে দেশে-দেশে বাড়ী-বাড়ী ভিক্ষা মেগে খেয়ে বেড়াই!' কৃষ্ণকায় লোমশ-দেহ জনার্দ্দন দাঁত বাহির করিয়া চাৎকার করিতে তাঁহার মূর্ত্তি প্রকৃতই ক্রুদ্ধ ভল্লুকের মত হইয়া উঠিল। বালকগণ করতালি দিয়া হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিল, 'ওরে, জনা-ভালুক ক্ষেপেছে রে—জনা-ভালুক ক্ষেপেছে।' লোকপুরের বালক বৃদ্ধ বহু লোক জনার্দ্দনকে পশ্চাতে 'ভালুক-চাটুয্যে' বলিয়া নামকরণ করিয়াছিল।

শিরোমণি মহাশয়ের কথায় ও বালকদিগের উপহাস্যে জনার্দ্দন ক্ষিপ্ত-কুক্কুরের ন্যায় হইয়া উঠিল। সে শিরোমণি মহাশয়ের মুখের নিকট হাত নাড়িয়া কহিল, 'তুমি টিকি নেড়ে বেশী

বড়াই ক'রো না। ভিখিরি বামুনের আবার এত বাড়াবাড়ি কিসে?' যখন শিরোমণি মহাশয় অপমানিত হইলেন, তখন অনেক লোক ক্রোধে গর্জ্জিতে লাগিল। শিরোমণি মহাশয় সমাজের মাথা—আদর্শ মহাপুরুষ। গুণে জ্ঞানে তিনি লোকপুর অঞ্চলের ছোট বড় সকল লোকের প্রাণের দেবতা। তাঁহার অপমানে সমবেত লোকসকল ক্রুদ্ধ হইয়া জনা চাটুয্যেকে নানা ভাবে গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল, গোলযোগ ক্রমে ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল। জনার্দ্দনের পক্ষে মতি বসু প্রভৃতি আরও অনেক ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া বিষম বিবাদ বাড়াইবার উপক্রম করিতে জনতা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল! উভয় পক্ষ হইতে গগনভেদী 'মার' 'মার' শব্দ উত্থিত হইয়া হরিষবাবুর বৃহৎ ভবন ছাইয়া ফেলিল। মহিলাগণ যিনি যে অবস্থায় ছিলেন তিনি সেই অবস্থায় উপর ছাদে দাঁড়াইয়া ভীত চক্ষে ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। বাঁকুড়া, মানভূমের বামুন ঠাকুরেরা ঝাঁঝরা, ছাতা হাতে লইয়া ছুটিয়া আসিল। তাহারা উচ্চকণ্ঠে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, 'আমি বিষ্ণু-ঠাকুরের সন্তান' কেহ কহিল, 'আমি সাধুর সন্তান' কেহ কহিল, 'আমি ভগীরথের বংশের তিলক'—আমরা উপস্থিত থাকতে ব্রাহ্মণ ভোজনের ভাবনা?'

ঠাকুরদের মধ্যে দোলগোবিন্দ মুখুয্যে সর্ব্বত্র খুব কুলের গৌরব করিয়া বেড়ায়। তাহার পিতা কোথা হইতে আসিয়া মানভূম জেলায় দশ পনের খানি গ্রামে আপনার কুলের বড়াই করিয়া

দশ পনেরটি বিবাহ করিয়া কোথায় প্রস্থান করে! সে কোথায় জন্মে, কোথায় মরে তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারে নাই। দোলগোবিন্দের মাতা, স্বামীর প্রস্থানের বহুবৎসর পরে দোলগোবিন্দকে প্রসব করে ও মাথায় মসলার ডালা লইয়া গাঁয়ে-গাঁয়ে বেচা-কেনা করিয়া দোলগোবিন্দকে মানুষ করে। দোলগোবিন্দ চারি পাচ বৎসরের হইলে, জননী শিবাভূমিজকে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়া এক হোটেলে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত হয়। শিবাভূমিজ মরিলে, দোলগোবিন্দের মাতা হাতে কিছু টাকা করিয়া গাঁয়ে ফিরিয়া আসে ও একটা ভোজ দিয়া সমাজে উজ্জ্বলরূপে ধর্ম্ম বজায় করে। দোলগোবিন্দ মানুষ হইয়া হাতা, বেড়ী, ঝাঁঝরা সম্বল করিয়া 'ঠাকুর' বৃত্তি অবলম্বন করে। গলায় ময়লা কাল পৈতা ছাড়া তাহার ব্রাহ্মণত্বের অপর কোন পরিচয় পাইবার যো নাই।—সে সদরে ছুটিয়া আসিল। তখন মুণ্ডিত-মস্তক হরিষবাবু অঙ্গনে যাইয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর পদতলে পড়িয়া রোদন করিতেছিলেন। দোলগোবিন্দ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'বাবু' ভয় কি আপনার, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি সাক্ষাৎ বিষ্ণু-ঠাকুরের সন্তান। এক আমাকে খাওয়ালে আপনার দশহাজার বামুন-ভোজনের ফল হবে। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমার তাঁবে আরও অনেক ভাল ভাল কুলীন বামুনের ছেলে আছে, উঠুন আপনি, আপনার জাতকে আর খোসামোদ করতে হবে না।' জনা চাটুয্যের দল

তখন ক্রোধে প্রজ্জলিত অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। জনা উত্তেজিত কণ্ঠে উচ্চৈস্বরে কহিল, 'আপনারা এখন ভেবে চিন্তে দেখুন, মানুষের খাতির করবেন কি জাত ধর্ম্ম বজায় রাখবেন। মানুষ গেলে মানুষ মিলবে কিন্তু জাত ধর্ম্ম একবার গেলে আর তা ফিরে পাওয়া যায় না। বিশেষ এমন কাজ—এত বড় দুরূহ কাজ ক'রে লোকে যদি অনয়াসে হাসতে হাসতে পার হ'য়ে যায়, তবে সমাজের তো আর কোন ক্ষমতাই থাকে না। তা হলে যার যা মনে লাগবে, সেই তা করতে থাকবে।'

জনার কথায় নিমন্ত্রিত লোকদিগের মধ্যে একটা খুব গোলমাল বাধিয়া উঠিল। কতকগুলি অজ্ঞ মূর্খ লোক বলিয়া উঠিল, 'তাই তো বটে, সমাজ কি এমনই মরা ?' যাহারা নামে গন্ধে কুলীনের বংশধর ছিল, তাহারা কহিল, 'সমাজের কুলীনের ছেলেরা কি মরেছে ? রাজা বল্লালসেনের নাম কি এমনি ক'রে এর মধ্যে ডুবে যাবে ? বটেই তো, যার যা মনে লাগবে সে কখন তা করতে পারবে না। গোপাল বোস সমাজের বুকে বসে এত বড় কাজ করে যে হাসতে হাসতে পার হয়ে যাবে, তা কখন হবে না। না—কখন না !'

জনা এই সময় চীৎকার করিয়া কহিল, 'একা কি গোপাল ? গোপালের মেয়ে বৌ-তে না করছে কি ?'

গোপাল এতক্ষণ নীরবে এক পাশে বসিয়াছিল। তাহার ধৈর্য্য সহ্য-সীমা ছাড়াইয়া উঠিল, সে উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। বহু যুবক তাহার সঙ্গে উঠিয়া জনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল,তাহাদের

মধ্যে কেহ কেহ জনাকে ধরিয়া প্রহার করিবার উদ্যোগ করিল। গতিক ভাল নয় বুঝিয়া জনা সদলে চলিয়া গেল।

শিরোমণি মহাশয় উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, 'পাতা করিয়া দাও, ভোজন ক্রিয়া আরম্ভ হোক, যার খুসি হয় খাবে।' পরিবেশক দল কলাপাতা ও লবণ লইয়া বাহির হইল। হরিষবাবুর ভোজনের বিরাট আয়োজন। কতকগুলি প্রকৃত ভদ্রলোক জনার দলের অন্যায় বুঝিয়া, গোপাল বসুর সততা জানিয়া কহিল, 'আমরা গোপাল বোসকে চিনি, পাতা পাতিয়া দিন, আমরা বসি।' এই বলিয়া অনেক লোক বসিয়া গেল। বৃহৎ অঙ্গনের দুই অংশে দুই ভাগে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের ভোজনের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ কায়স্থ দুই ভাগে দুই দল বসিয়া গেল। যাহারা গোল বাধাইবার জন্য উৎসুক উৎফুল্ল হইয়াছিল, তাহারাও হরিষবাবুর আয়োজন দেখিয়া লোভ সামলাইতে পারিল না। মোণ্ডা মিঠাই সন্দেশ রসগোল্লার পাহাড় স্তূপ দেখিয়া অনেকের রসনা লক্ লক্ করিতেছিল। তাহারা পাতার উদ্যোগ দেখিয়া বসিয়া পড়িল। কেবল কাশীনাথের কথা শুনিয়া কতকগুলি লোক জনার দলে যোগ দিবার জন্য প্রস্থান করিল—ফলে সমাজে দুইটা দল হইয়া দাঁড়াইল।

হরিষবাবু বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া কহিলেন, 'আমার মা-ঠাকরুণ পুণ্যবতী ছিলেন, তাঁর কাজে এমন হলো কেন? আমি মহাপাপী। আমারই পাপের ফলে—আমারই দুরদৃষ্টে এই রকম ঘট্‌লো।' এই বলিয়া তিনি সজোরে বুক

চাপড়াইতে লাগিলেন। শিরোমণি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, 'বৃহৎ কর্ম্মে গোল হ'য়েই থাকে। জান তো বাপু, বড় কাজ কর্‌তে গেলেই হিমালয়ের মত পাষাণ—অচল অটল হ'তে হয়। জানই তো, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে দুষ্ট শিশুপাল কি গোলযোগ বাধিয়েছিল। সে তো কাল ছিল দ্বাপর—আর এটা হচ্ছে ঘোর কলি।'

হরিষবাবু শিরোমণির পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, 'ওঃ, আমার যে মাথা ঘুরছে! চারিদিক অন্ধকার দেখছি! আমার একি হলো!' শিরোমণির উৎসাহ বাক্যে হরিষবাবু প্রশান্ত ও প্রবুদ্ধ হইয়া চারিদিকে করযোড়ে ঘুরিতে লাগিলেন। মহাসমারোহের কার্য্য মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল। চারিদিকে সন্দেশ, রসগোল্লার ছড়াছড়ি—মোণ্ডা মিঠাইএর শিলাবৃষ্টি। হরিষবাবুর বৃহৎ ভবন 'দিয়তাং ভোজ্যতাং রবে মুখরিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নয়ন বৌ নীরব—নিস্তব্ধ—নিস্পন্দ। ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া উর্দ্ধদৃষ্টে বিশাল শূন্য আকাশের পানে শূন্য দৃষ্টিতে শূন্য প্রাণে নয়ন কত কি ভাবিতেছে। নয়নকে দেখিলে মনে হয়, যথার্থ শুভ্র

প্রস্তরখণ্ড বুঝিয়া কোন অপার্থিব-শিল্পী এ অপার্থিব সুন্দর সৌম্য মূর্ত্তি বাহির করিয়াছে, যেন এ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি কোন অজ্ঞাত রাজ্যে গুপ্ত ভাবে লুক্কায়িত ছিল, স্বয়ং বিধাতাও তাহার সন্ধান জানিতেন না। গোপাল দূর হইতে নয়নের সে অলৌকিক মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইল। তাহার চরণযুগল মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া রহিল। সত্যই গোপালের নড়িবার বা চলিবার শক্তি যেন নিমিষে তিরোহিত হইল। সে যেখানে ছিল সেইখানে নীরবে দাঁড়াইয়া একমনে কত কি ভাবিতে লাগিল। ভাবনার ভীষণ স্রোত-প্রবাহে গোপাল আপনাকে ভাসাইয়া দিল, ভাবিতে ভাবিতে গোপাল এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিল। সে আবার দেখিল, যেন শরতের সান্ধ্য-গগনে মেঘমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী অপূর্ব্ব জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি তাহার গৃহে বিরাজিতা! নয়নের এই আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া গোপালের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। গোপাল সাহসে ভর করিয়া, নয়নের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গোপালকে দেখিয়া নয়ন সরলা বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল।

নয়নের আজ এ কি ভাব—এ কি মূর্ত্তি! নয়নের সে হাস্যময়ী চির বসন্তময়ী মধুর ভাব আজ কোথায়? কোথায় সে অপূর্ব্ব ভাব আজ হঠাৎ লুকাইল? কুসুমাদপি-নয়ন সত্যই আজ বজ্রাদপি কঠোর! নয়নের সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি আজ কঠোর বজ্রময়ী। নয়নের নয়ন আজি অশ্রুভরা! অশ্রুপূর্ণাক্ষী নয়ন, কঠোর দৃষ্টিতে পতি-মুখপানে চাহিয়া রহিল। গোপাল বিগলিত হৃদয়ে, করুণ কণ্ঠে, নয়নের হাত দু'খানি ধরিয়া

কহিল, 'নয়ন, আমায় ক্ষমা কর—আমায় দয়া কর। আমি অধম—আমি পতিত—আমি চণ্ডাল। তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী-স্বরূপিনী—তুমি কমলা—এ অধমের গৃহ তোমার উপযুক্ত স্থান নয়। জানি না, কোন জন্মের পুণ্যে—কোন সৌভাগ্যে তোমার মত মহারত্ন আমার গৃহ উজ্জ্বল করেছে—কোন তপস্যার ফলে তোমার মত দেবী আমার পাপ-সংসারে উদয় হয়েছে। সত্যই তুমি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। এ গৃহের, এমন সংসারের যোগ্যা তো তুমি নও! এ মাটীর পৃথিবীর উপযুক্তাও তুমি নও। বিধাতা বড় দয়া ক'রে তোমার মত অমূল্য রত্ন আমাকে দিয়েছিলেন, আমি পাপী, তোমায় রাখতে পারব কেন?' বলিতে বলিতে নয়নজলে গোপালের হৃদয় ভাসিয়া গেল।

গোপাল কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় কহিল, 'নয়ন, আমি তোমায় চিনি—তোমায় ভালরূপেই জানি, জানি তুমি এঁদো-ডোবায় সোনার কমল। আমার এই অন্ধ-কূপে তোমার মত সোনার শতদল-ফুলে সংসার আলো করবে, স্বর্গের সৌরভ বিলাবে, এ তো কল্পনার অতীত। তুমি দেবলোকের সুধা-স্বরূপিণী! অসুরের এ অমৃত কখন সুখভোগ্য হতে পারে না! আজ আমার ঘরে প'ড়ে কমলের বক্ষে বজ্রাঘাত সইতে হলো। এ দৃশ্য যে আর দেখতে পারি না' বলিয়া গোপাল বসিয়া পড়িল। এ কি! গোপাল যে সংজ্ঞাহীন—মূর্চ্ছিত!

নয়ন পাগলিনীর ন্যায় ভীত ত্রাস্তভাবে উঠিয়া গোপালকে শুশ্রূষা করিতে লাগিল। দেবী-করস্পর্শে মৃতদেহে জীবন সঞ্চারিত

হইল। গোপাল ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল কিন্তু তাহার নয়নে পলক নাই—মুখে কথাটিও নাই। গোপাল নীরব—নিস্তব্ধ প্রস্তর-পুত্তলিকার ন্যায় নীরবে, হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সম্মুখে বসিয়া রহিল। নয়ন বৌ কহিল, 'দেখ, আমাদের দেশে একটা প্রসিদ্ধ কথা চলিত আছে—'বিপদিধৈর্য্যম।' মানুষ যে কেমন মানুষ—সে যে কতটা পশুত্ব ছেড়ে মনুষ্যত্ব লাভ করেছে—কতটা উঁচুতে উঠে বড় হয়েছে, তা বুঝে নেবার মাপকাটি—বিপদে সাহস, বিপদে ধৈর্য্য। শত্রুকে বিনষ্ট করতে হলেও আগে ভাবতে হয়—আগে তার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত ঠিক করতে হয়—তাতে প্রবল ধৈর্য্য চাই। ধৈর্য্য নইলে মাথার ঠিক থাকে না। মাথা ঠিক রাখতে না পারলে কোন ছোট কাজের ব্যবস্থা করা যায় না, বড় কাজের সাধনা তো বহুদূরের কথা। গোপাল রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, 'আর কাজ করতে জীবনে সাধ নাই। যে জগতে বিচার নাই, যে সংসারে সৎকার্য্যের পুরস্কার অধোগতি—বিড়ম্বনা অসৎকার্য্যের পরিমাণ—সম্পদ-সুখ-সম্ভোগ, সে জগতে—সে সংসারে আর কাজ করবার ইচ্ছা নাই। মনে হচ্ছে, সে সংসারে এই ভারী জীবনটাকে বয়ে বেড়ানও মহা বিড়ম্বনা।'

নয়নের ম্লান মুখে এতক্ষণে হাসির শুভ্র সমুজ্জল রেখা সমুদ্ভাসিত হইল। নয়ন স্বভাবসঙ্গত মৃদুহাস্যে কহিল, 'তুমি যে বহু সময় বহুবার বলেছ, ভগবানের সেই অমৃতবাণী—

'কর্ম্মণ্যে রাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন।'

বাস্তবিক জীবনের এতদিন কেটে গেল, এখন যদি ভগবানের

সেই মহৎ বাণীর অর্থ প্রাণের মধ্যে না বুঝতে পারি যদি সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে এতটা ভুক্তভোগী হ'য়েও না অনুভব করতে পারি যে কর্ম্মেই মানুষের অধিকার, অন্য অধিকার তার একটুও নাই, তবে এতদিন এ জীবনটা বয়ে বেড়ানই যে বৃথা হলো।

গোপাল, গভীর হৃদয়ের গভীর অন্তস্থল হইতে কহিল, 'আর ফাঁকা মুখের ফাঁকা কথায় চিঁড়ে ভিজে না। আর আমি কিছুই বিশ্বাস করি না—কিছুই আর মানতে চাই না। ভগবান—ভগবানের রাজ্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম বলে কিছু যে ভেদাভেদ আছে—পাপ পুণ্য।বা পাপ পুণ্যের ফলাফল কিছু যে আছে, তা আর প্রাণ যেন কিছুতেই মানতে চায় না।'

নয়ন গোপালের মুখে আজ কথাটা শুনিয়া প্রাণে বড় ব্যথা পাইল। সে জানিত, গোপাল ভগবানে একান্ত বিশ্বাসী—ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরাগী। এমন বিরল-বিশ্বাসী ভক্ত সাধু স্বামীর প্রাণে হঠাৎ কেন এ বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিল। স্বর্গের পবিত্র শীতল বাতাসে কেন নরকের এমন বিকট পুতিগন্ধময় বায়ু বহিল? এ কি হইল! নয়ন আকুল হৃদয়ে সস্নেহে নীরব-ভাষে ভগবানকে ডাকিল, প্রাণের ভাষে কহিল, 'ভগবান, দয়া কর প্রভো, এ ঘোর সঙ্কট হ'তে রক্ষা কর।' ব্যাকুল কণ্ঠে স্বামীকে কহিল, 'কেন, তুমি যে সকল সময় বলতে, ভগবানের পথ রহস্যময়। সাধু কেম্পিনের এ কথাটা তোমার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। আজ কোথা গেল স্বর্গের সে মহামন্ত্র?'

গোপাল বিরক্তস্বরে উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, 'চুলোয় গেল সে

মন্ত্র—চুলোয় যাক্ সে মন্ত্র। মন্ত্র-তন্ত্র সব মিছে।' বক্ষ যেন বিদীর্ণ করিয়া গোপালের মুখে বাহির হইল, 'ভগবানের অস্তিত্বে আজ আমার অবিশ্বাস হয়েছে—তাঁর বিধানে আজ অভক্তি জন্মেছে।'

নয়ন কহিল, 'ছি ছি, অমন কথা আর মুখে এনো না।'

গোপাল উচ্চ কণ্ঠে সপ্তমে বজ্র নির্ঘোষে ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিয়া উঠিল, 'আনবো—শতবার সহস্রবার আনবো। নইলে তোমার মত নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রে কলঙ্ক, এও কি প্রাণে সহ্য হয়? দুর্ব্বিসহ বিষাক্ত-ক্ষতে অমৃত প্রলেপের ন্যায় নয়ন মৃদুহাস্যে কহিল, 'সহ্য সকল গুণের—সমুদয় শক্তির শ্রেষ্ঠ গুণ—শ্রেষ্ঠ শক্তি। সহ্যই সাধনা—সহ্যই তপস্যা—সহ্যই যোগ। সমগ্র গীতা, সাধনার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, ধীরভাবে, অচল অটল ভাবে—সহ্য করা। তাতেই মানুষের মনুষত্ব বিকশিত হয়। দণ্ড-সহিষ্ণুতাই মুখ্য সাধনা, সেই বলেই মানুষ ধৈর্য্য বীর্য্যবান মহা মানুষ হ'য়ে থাকে সেই মানুষের নাম, 'লৌহমানব' যাকে পাশ্চাত্যেরা আজকাল অতি-মানব superman বলে ব্যাখ্যা করেছে। এদেশে বহুকাল পূর্ব্বে ভগবান অতিমানবের গুঢ়তত্ত্ব বুঝিয়ে গেছেন। যোগি-জনই অতিমানব। যোগী এ জগতে সুখ দুঃখের অতীত মহাপুরুষ। তিনিই পরমানন্দের অধিকারী। একমাত্র স্থিতি প্রজ্ঞ স্থিতিধমুনিই মহাপুরুষ—মহাযোগী। ভগবান তাঁর স্বরূপ লক্ষণ তুলে বলছেন :—

প্রজহাতি যদা কামান সর্ব্বান পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্ট স্থিত-প্রজ্ঞ তদোচ্যতে॥

দুঃখম্বনুদ্বিগমনা সুখেষু বিগত স্পৃহ।
বীতরাগে ভয়ক্রোধ স্থিতিধী মুনিরুচ্যতে॥

গোপাল মুগ্ধনেত্রে দেখিল—তাহাদের সম্মুখ হইতে জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি তিরোহিত হইয়াছে, তাহার স্থলে বীণাপাণি ভারতী মূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে স্বহস্তে বিমানামৃত বিতরণ করিতেছেন। গোপাল বিস্ময়ে—কৌতুহলে অভিভূত হইয়া সাক্ষাৎ ভারতীর সম্মুখে নীরবে—নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল গোপাল আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, 'নয়ন, সত্যই তুমি স্বর্গের দেবী, তুমি যথার্থই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীরূপিণী। আমার বহু পুণ্য ফলে—আমার বহু জন্মের তপস্যা আর মহৎ সৌভাগ্য ফলে তুমি মর্ত্তলোকে এসে আমার মত দীন হীনের কুটীর আলোকিত করেছ। আমি বুঝলেম, তুমি স্বয়ং বাগ্‌দেবী—তুমি সাক্ষাৎ সীতারূপিণী। তোমার মত রমণী-রত্ন যে পুণ্যবান, যে ভাগ্যবান লাভ করে, তার আর অভাব কি—তার আবার দুঃখ যন্ত্রণাই বা কি?'

এই বলিয়া গোপাল মুগ্ধনেত্রে নয়নের অপার্থিব সৌন্দর্য্য মণ্ডিত মুখপানে চাহিয়া রহিল। চাহিতে চাহিতে গোপালের মতিভ্রম ঘটিল। উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া গোপাল কহিল, 'নয়ন, তোমার মত দেবীর অতি শুভ্র অতি পবিত্র নামে কলঙ্ক! এও কি প্রাণে সহ্য হয়? না না, এ সহ্য হয় না—কখনই না! প্রাণ থাকতে এ সহ্য হয় না। এর প্রতিশোধ পূর্ণরূপে নিতে পারি তো এ জীবন রাখবো, নইলে'—এই বলিয়া

গোপাল ক্ষিপ্তের ন্যায় দ্রুতপদে গৃহ হইতে প্রস্থান করিল। উৎকণ্ঠিতপ্রাণে নয়ন শয্যায় শায়িত উষার পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উষা বয়স্থা। উষা প্রায় তের চৌদ্দ বর্ষ বয়ক্রম অতিক্রম করিয়া পঞ্চদশে পদার্পণের উপক্রম করিয়াছে। কমল-কলিকা পূর্ণাঙ্গে বিকশোন্মুখ—ত্রয়োদশীর শশধর—পূর্ণিমার পানে প্রধাবিতা।

নয়ন কন্যার পার্শ্বে বসিয়া ডাকিল, 'উষা!' উষা উত্তর করিতে পারিল না—নীরবে রহিল। মা দেখিল, মেয়ের চক্ষের জলে বালিস ভিজিয়া গিয়াছে। উষা তখনও শয্যায় পড়িয়া নীরবে রোদন করিতেছিল। মা একবার দুইবার তিনবার মেয়েকে ডাকিল, মেয়ে আর স্থির থাকিতে পারিল না, বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া মায়ের পা-দু'খানি জড়াইয়া ধরিল। ভগ্নকণ্ঠে ভগ্ন-ভাষে কহিল, 'মা, চলো, আর আমরা এখানে থাকব না—লোকপুরে আর মানুষের থাক্‌তে নাই। গাঁ এখন শিয়াল কুকুরের বাসা হ'য়েছে।'

নয়ন দেখিল, বড় সঙ্কট! চারিদিকেই মহা সঙ্কট! গাঁয়ে নানা কথা নানা লোকের মুখে—ঘরে স্বামী উন্মত্তের ন্যায়—কন্যা মৃতপ্রায়—ঘরে বাহিরে বিপদ! এখন এ অবস্থায় কোথা যাই, কি করি! নয়ন ভাবিয়া ভাবিয়া বুঝিল, এ সময়ে বড় ধৈর্য্য ধরিতে হইবে—বড় কঠিন হইতে হইবে। কোমলে কঠোর মিশিয়া এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আজ নয়ন ধারণ করিল। নয়ন ধীর গম্ভীর স্বরে কঠোর কণ্ঠে কহিল, 'ঊষা, তুই তো এখন আর কচি মেয়ে ন'স। ছিঃ অমন ছেলেমি ক'রোনা। কিসের ভাবনা? কান্না কেন? তুই তো জানিস—তুই তো বল্লি বাছা, গাঁ এখন শিয়াল কুকুরের বাসা। শিয়াল কুকুরের কথায় কি এসে যায় মা?' ঊষা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, 'না মা, তাদের কথা ধরি না, এখানে আমার বড় ভয় করছে। আজ বড় ভয়ের কথা শুনেছি।'

নয়ন ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি কথা?'

পাছে মা ভয় পায় বলিয়া কথাটা বলিতে ঊষা ইতঃস্তত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, কথাটা এখনি বলি কি না। মায়ের কাছে এখনই বলি, কিম্বা বাবা আসিলে সকলের কাছে বলি। এই ভাবিয়া ঊষা নীরবে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে গোপাল হাসিমুখে ঘরে ফিরিয়া আসিল। পতির হাসিমুখ দেখিয়া নয়ন সশরীরে স্বর্গের সিঁড়িতে পদার্পণ করিল। গোপালের এমন হাসিভরা মুখখানি নয়ন কিছুদিন হইতে দেখিতে পায় নাই। বহুক্ষণ পরে তৃষিতা-চাতকিনী—নবীন মেঘ দেখিয়া আনন্দ-নীরে ভাসিতে লাগিল। গোপাল আসিয়া

কহিল, 'এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম, বুকের বোঝা—পাথর নেমে গেল।'

নয়ন কহিল, 'কেন, হ'লো কি? হঠাৎ এমন কি স্বর্গ ধরে ফেল্লে যে, সকল দুঃখ—সকল যন্ত্রণা জুড়িয়ে গেল, ব্যাপার কি?'

গোপাল কহিল, 'শিরোমণি মহাশয়ের কাছে গেছলুম।'

নয়ন...তারপর?

গোপাল...তারপর বল্লেন, কোন চিন্তা নেই। আমি তো তোমায় জানি, তোমার খবরও সব রাখি, বাজে লোকের বাজে কথায় তুমি মন খারাপ ক'রোনা। জনা চাটুয্যেকে—তার দলবলকে এ অঞ্চলে না জানে কে—না চিনে কে? তুমি স্বর্গ—তারা নরক। তারা কি তোমায় ছুঁতে সাহস করতে পারে গোপাল?

উষা বলিল, 'বাবা, ওসব কথা শুনোনা। এখানে কাউকে আর বিশ্বাস নেই।'

গোপাল দৃঢ়স্বরে কহিল, 'সে কি! কি বলিস উষা? শিরোমণি মহাশয় কি মানুষ? তিনি যে দেবতা—দেবতা কি, আমি তো বলি, তিনি স্বয়ং ভগবানের অবতার। তাঁর কথা বিশ্বাস করব না, তাঁর কথা মানব না তো কাকে মানবো—কার কথা শুনবো মা?'

উষা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, 'আমি হর-পিসির কাছে শুনলুম, জনা চাটুয্যে এক ভয়ানক ডাকতের দল তৈরি

করেছে, সে ডাকাতের দল নিয়ে আমাদের বাড়ী ডাকাতি করবে।'

গোপাল হাসিয়া কহিল, 'কি জন্য ডাকাতি করবে, আমাদের কি আছে? টাকা কড়ি গহনা-পাতি থাকলে সেই লোভে ডাকাতি করে। আমাদের তো টাকা কড়ি গহনা-পাতি কিছুই নেই, কি জন্য ডাকাতেরা আসবে?'

উষা কহিল, 'শত্রু কি কেবল টাকা নিতে আসে? তোমার যে পায়-পায় শত্রু বাবা? তোমার টাকা না পেলেও জীবন নিতে পারে তো।'

গোপাল উষার কথা শুনিয়া একটু হাসিল। নয়নের প্রাণ চমকাইয়া উঠিল—মুখ শুকাইয়া গেল। গোপালের মুখে হাসি দেখিয়া নয়ন মনে মনে বিরক্ত হইল। নয়ন বিরক্ত কণ্ঠে কহিল, 'তোমার সবই অগ্রাহ্য। তুমি কিছু গ্রাহ্য করতে চাও না। বিপদ ঘটতে বেশীক্ষণ লাগে না। ভগবান রক্ষা করছেন তাই এমন জায়গায় আজও প্রাণে বেঁচে আছি।'

গোপাল হাসিয়া কহিল, 'কথাটা সকল সময় মুখে বল, কাজে দেখাতে পার কৈ? 'রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে!' —কথাটা কতদিন কতবার তোমার মুখে শুনতে পাই। কথাটা কাজে দেখাও, নইলে ফাঁকা-মুখের ফাঁকা-কথার দাম কি?'

নয়ন গোপালের কথার ঠিক উত্তর খুঁজিয়া পাইল না! বাস্তবিক সে মনে প্রাণে বুঝিত ও বিশ্বাস করিত যে, ভগবান

যাহা করিবেন তাহাই হইবে, তাহা রদ করে এমন কলি-জগতে আর কিছুই নাই। এইটা নয়নের প্রাণের ধারণা—হৃদয়ের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস লইয়াই নয়ন নিতান্ত ভারাক্রান্ত প্রাণটাকে বহিয়া গোপালের আঁধারময় কুটীর আলো করিয়া রহিয়াছে।

গোপাল হাসিয়া কহিল, 'যে দিন দুনিয়ার মালিক বুঝবেন, এ জীবনটাকে এ সংসারে রাখবার আর দরকার নাই, সেদিন তিনি নিশ্চয়ই এটাকে টেনে নেবেন। সে জন্য তোমার আমার ভাবনা নিস্ফল, তুমি আর ভেবোনা। তুমি আমি ভাবনা-সাগরে ডুবে মলে মেয়েটার উপায় হবে কি? দেখছ কি উষার দশা কি হয়েছে! দিন দিন সে যে শুকিয়ে উঠছে!'

নয়ন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, 'উষার বোধ হয় অসুখ হয়েছে। রেতে ওর গা'টা গরম বলে আমার বোধ হয়েছিল।' উষা কহিল, 'না মা, আমার গা'টা কিছু গরম হয়নি। বড় বিষম স্বপ্ন দেখেছিলাম, ভয়ে আমার প্রাণ কাঁপতে লাগলো! আমার দেহটা যেমন জল হ'য়ে গেল।' গোপাল উৎকণ্ঠিত প্রাণে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি স্বপ্ন দেখেছিলে উষা!' উষা ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, 'সে কথা তোমার শুনে কাজ নেই বাবা।'

গোপাল ছাড়িল না, জেদ করিয়া কহিল, 'না মা, সে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। স্বপ্নের কথাটা তোমায় বলতেই হবে।' উষা অগত্যা কহিল, 'বড় ভয়ানক স্বপ্ন বাবা, এমন স্বপ্ন আমি জীবনে কখন দেখিনি। আমার মনে হ'ল, জনা—জলন্ত মশান থেকে আমাদের বাড়ী এলো। মশানের আগুন জলতে জলতে

জনার মত চেহারা হ'লো, তারপর হাজার হাজার মানুষ জ্বলন্ত-জনা হয়ে উঠলো, তারা সকলের ঘরের চালে আগুন হয়ে-হয়ে ঘুরতে লাগলো। গাঁ-ময় আগুন—দেশময় আগুন—চারি দিকে আগুন হু হু জ্বলতে লাগলো। চারিদিকে বেড়া-আগুন, কোথাও পালাবার পথ নেই। তারপর আকাশ থেকে আগুন নেবে এসে মাকে তুলে নিয়ে গেল। বাবা, তুমি আমি কেবল সেই আগুনের মধ্যে পড়ে রইলুম। তারপর গাঁ আগুনে জ্বলতে লাগলো।' বলিতে বলিতে ঊষা কাঁপিতে লাগিল, তাহার মুখে আর কথা বাহির হইল না। গোপাল, প্রবোধ দিবার জন্য মেয়ের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, 'আর ওসব কথা মনে করোনা। স্বপ্নের কথা সব মিথ্যে। মিথ্যে ভাবনা ভেবো না, এস আমরা ওঘরে গিয়ে গান করি।'

গোপাল ঊষার হাত ধরিয়া বাহিরের ঘরে যাইয়া ঊষার হাতে হারমনিয়ম দিল, পরে পিতা পুত্রীতে গান গাহিতে লাগিল। ঊষা গানের সঙ্গে হারমনিয়ম বাজাইতে আরম্ভ করিল। গোপাল পত্নী ও কন্যাকে যেমন লেখাপড়া শিখাইত—তেমনি তাহাদিগকে লইয়া সঙ্গীতেরও অনুশীলন করিত। কেবল নিজের ঘরে নয়, বাহিরে বাগ্দীদিগের পাড়ায়ও সে লেখাপড়ার সঙ্গে গাহনা-বাজনার শিক্ষা দান করিত। এই কারণে তাহার শিক্ষা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বড় আমোদের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

লোকপুর গাঁয়ে খুব গুজব উঠিল, গোপালের ঘরে সত্বর ডাকাত পড়িবে। জনা যেরূপ সাহসে বলে বলিয়ান—কূট বুদ্ধিতে তেমনি হীন, দুর্ব্বল। তাহার বুদ্ধির বিড়ম্বনায়, পরামর্শের দোষে কথাটা বাহির ও জাহির হইয়া পড়িল। দেশের সকলেই জনাকে ও তাহার দলবলকে জানিত। বিশেষতঃ হরিষবাবুর মাতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে জনার্দ্দন কর্ত্তৃক যে একটা বিরাট গণ্ডগোল ঘটিয়াছিল, তাহাতে লোক-পুর সমাজের অনেকেই জনাকে চিনিয়াছিল। জনাই যে একজন যে সে লোক নহে, এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধরিয়া সেদিন বহু লোক ঘরে ফিরিয়াছিল। লোকপুরঅঞ্চলে বহু স্ত্রী পুরুষ সেদিন হরিষবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিল। স্ত্রীলোকদিগের অনেকেই মনে করিয়াছিল, জনা চাটুয্যে মনে করলে অনায়াসে রাজার রাজত্ব ঘুচাইয়া দিতে বা কাড়িয়া লইতে পারে। যাদব শিরোমণি মহাশয়ের মধ্যস্থতায় ও গোপালের আপনার সৎগুণে ও সদাশয়তায় বিশেষতঃ হরিষবাবুরর মুখ চাহিয়া সেদিনে ভোজের ব্যাপারে বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটে নাই এবং দলাদলির প্রসঙ্গে জনার-ই পরাজয় ঘটিয়াছিল, তথাপি উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে অনেকেই মনে মনে বুঝিয়াছিল, জনা একজন অসাধারণ সাহসী ও বলবান পুরুষ।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকেই মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিল, জনা-চাটুয্যে সত্যিই কলির ভীম। অনেকেই কহিতে লাগিল, জনার্দ্দনের দুই আঙ্গুল পরিমাণ লাঙ্গুল কেহ কেহ নাকি চক্ষে দেখিয়াছে। জনা যথার্থই হনুমানের অবতার বিশেষ। কেহ বলিতে লাগিল, জনাকে লাঠির ভর করিয়া লাফাইয়া দু'তলার উপরিস্থ ছাদে উঠিতে অনেকে দেখিয়াছে। কেহ কহিল, জনা পিশাচ-সিদ্ধ। সে আমা-বস্যায় শনি মঙ্গলবারের রাত্রিকালে শ্মশানে যাইয়া মড়া জাগাইয়া তাহার সহিত কথা কয়। এইরূপ জনা সম্বন্ধে নানাজনে নানা কথা কহিতে লাগিল। ফলে জনা দেশমধ্যে অচিরেই একজন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ও প্রচারিত হইয়া উঠিল। দেশের বহু বদমায়েস—যাহাদের চুরি জুয়াচুরি ভিন্ন উদরান্ন সংস্থানের আর উপায়ান্তর নাই, তাহারা অনেকেই জনার্দ্দনের বিজয়-নিশানের তলে আসিয়া আশ্রয় লইল। জনার্দ্দনের দল বিলক্ষণ পুষ্টি লাভ করিল। জনার্দ্দন মনে করিল, এখন সে শিখ-পাহারা-পরিবেষ্টিত ধনবান হরিষবাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত অনায়াসে লুট-দরাজ করিতে সক্ষম।

জনা কতকগুলি লোক লইয়া রজনীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। আকাশ মেঘাবৃত, গাঢ় ঘন অন্ধকারে ভীষণ রাত্রিটা যেন বিষম ভারাক্রান্ত ও স্তম্ভিত হইয়া নীরবে ঠিক একই জায়গায় নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জনার দলের লোকের পদশব্দে ও নিশ্বাসে রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গেল। বৃক্ষশাখে পক্ষীসকল ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল,

একটা পেচক ঘনাবৃত পত্রের মধ্য হইতে ধূ ধূ রবে গভীর ডাক ছাড়িল। রজনী তখন গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্না। নিদ্রার ঘোরে কিছু সংজ্ঞা ছিল না। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গের সহিত তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। জনা তাহার দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিল, 'রজনী, ও রজনী?' রজনী ঘুমের ঘোরে জনার কণ্ঠস্বর ভাল বুঝিতে পারিল না, বলিল, 'কে?'

জনা কহিল, 'চিন্তে পাচ্ছ না, আমি গোপাল বোস। রজনী তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিল। দুয়ার খুলিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া প্রদীপ ধরাইল।

জনা সদলে রজনীর গৃহমধ্যে আসিয়া তক্তাপোষে বসিল। ঘরের মধ্যে হুঁকা, কলিকা, তামাক, টীকা সকলই ছিল, জনা কহিল, 'রমা শালা মড়ার মত চুপ করে বসে রইলি কেন! তামাক সাজ না। রমা জনার পূর্ব্বপরিচিত জনৈক বদমায়েস, রমাই জনার হুকুম তামিল করিতে প্রবৃত্ত হইল। তামাক সাজিয়া রমাই জনার হাতে হুঁকা দিল, জনা তখন গাঁজার নেশায় চক্ষু লাল করিয়াছিল। তামাক সেবন করিয়া জনাই রজনীর দিকে চাহিয়া কহিল, 'আর দেরি করলে সব কাজ পণ্ড হবে।' রজনী ভ্রূকুটী করিয়া কহিল, 'আমি কি দেরী করতে বলছি? গোপালের সর্ব্বনাশ যেদিন দেখব, সেদিন থেকে চার-গাঁয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়া।' বলিয়া একটু থামিয়া স্বর গাঢ় করিয়া পুনরায় বলিল, 'তোদের দিয়ে কি আমার সে দিন আসবে; তোরা মেয়েমানুষের অধম। তা নইলে গোপাল বোসের দামড়া-মেয়ে, নিশ্চিন্তে

বারো-গাঁয়ে খেয়ে পরে বেড়াচ্ছে!' বলিয়া বাষ্পাকুল নয়ন অঞ্চল দিয়া ঢাকিল।

জনাই রজনীর হাতে ধরিয়া কহিল, 'কাঁদিসনে ভাই, তোর জনাই থাকতে ভাবনা কিসের! এ কি গোপাল বোস! তুই একটু সহায় হ' ত, দেখি একবার ব্যাটা কোথায় যায়?' রজনী সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, 'আমি সহায় না হ'লে এতদিন তুই কোথায় থাকতিস জানিস!'

জনাই কহিল, 'থাক্ ওসব কথা পরে হবে।'

পরে উভয়ে অনেক রাত্র পর্য্যন্ত যে সমস্ত পরামর্শ করিল, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সেদিন প্রভাতে পূজা অর্চ্চনা সমাপন করিয়া নয়ন বৌ সবে মাত্র রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াছে, এমন সময় প্রবোধ,—'বৌদিদি কোথায়?' বলিয়া অন্দরের প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল।

নয়ন বৌ ত্রস্ত মস্তকে অঞ্চল টানিতে টানিতে পাকশালার বাহিরে আসিয়া সহাস্য আননে কহিল, 'ঠাকুরপো যে! এতদিনে মনে পড়ল বৌদিদিকে?'

'তোমাদের ভুলে যাব বৌদিদি' বলিয়া নিকটে আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল, 'তারপর, কেমন আছ বৌদিদি, খবর ভাল ত?'

নয়ন বৌ ম্লানমুখে কহিল, ‘খবর আর মন্দ বলি কি করে। ভগবান যা করেন সবই ত আমাদের ভালর জন্য? কাজেই খবর খারাপ বলতে পারি না।’ বলিয়া শুষ্ক হাসি হাসিলেন। প্রবোধ কহিল, ‘তোমার মত বৌদি’র উপযুক্ত কথা। উষা কোথায়, সে কেমন আছে?’ নয়ন বৌ বলিল, ‘সে বোধ হয় স্নান করতে গেছে, উষা! ও উষা! তোর কাকা এসেছে রে, এদিকে আয়।’ নয়ন কহিল, ‘ঠাকুরপোর এবার ক’দিন থাকা হ’বে? শরীরটাকে ত’ অর্দ্ধেক করে এসেছ।’

প্রবোধ হাসিয়া কহিল, ‘তোমরা পৃথিবীর কোন আপনার লোককে কখনও মোটা দেখলে না। এবারে থাকব বোধ হয় একমাস! আচ্ছা, যাবার আগে তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নেব যে, আমি মোটা হয়েছি’, বলিয়া হাসিতে লাগিল। এমন সময়ে গোপাল রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত শুষ্ক রুক্ষ মূর্ত্তী লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে প্রবোধকে দেখিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, ‘এই যে প্রবোধ, কখন এলে ভাই! তোমার কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম।’ প্রবোধ কহিল, ‘তোমার এ মূর্ত্তী কেন? কোথাও মড়া পোড়াতে গিয়েছিলে?’ গোপাল কহিল, ‘না গো না, ও পাড়ার বসুদের বড় ছেলের কাল রাত্রি থেকে কলেরা, সেই খানেই সারারাত্রি তার শুশ্রূষা করে তাকে সম্পূর্ণ নিরাপদাবস্থায় দেখে এখন ফিরছি।’ বলিয়া মুহূর্ত্তেক থামিয়া বলিল, ‘প্রবোধ, তোমার সঙ্গে বিশেষ গোপনীয় কথা আছে, যাবার সময় দেখা করে যেও।’ বলিয়া ঘরের দিকে চলিল।

নয়নবৌ প্রবোধকে কহিল, 'আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? এস, এখানে ব'স।' বলিয়া সেখানে একখানা আসন পাতিয়া দিল। প্রবোধ বসিয়া কহিল, 'দেশের খবর কি বৌদি?' নয়ন বৌ শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, 'দেশের খবর কি তা' তোমার বৌদিদি গ্রামের এক কোনে বসে কিছুই জানতে পারে না। তবে গ্রামের খবর যথাপূর্ব্বম্। তারপর যা কিছু, ওঁর কাছে শু'নো।'

'কিছু কিছু শুনেছি—সেই শ্রাদ্ধের সময়ে জনার কীর্ত্তি! বৌদিদি, এ আমি তোমায় বলে রাখলুম, আমি একটু সুবিধে পেলেই বেটাদের বদমাইসির ইতি করব।'

ভগবানের ইচ্ছে থাক্‌লে সে সুবিধে মিলতে কষ্ট হবে না। থাক্ সে কথা, এখন মেয়েটার একটা বিয়ে না দিতে পারলে অন্য আর কোন কথা মনে আনতে পারি না। যে সমাজ, সমাজের নিয়ম না মানলে চলবে না ঠাকুরপো। সমাজ যে চায় এই বয়সে কিম্বা এর আগেই মেয়েদের পাত্রস্থ করা। আমি যদি না করি, না পারি, সমাজ যে রাগ করবে সেটা ত' অন্যায় নয়। যে ক'রে হোক, এমাসে না হয় ওমাসে ঊষার বিয়ে আমি দেবোই এ তোমায় বলে রাখলুম।' এরূপ সময়ে সদরগৃহ হইতে গোপাল ডাকিল, 'প্রবোধ, বৌদিদির কাছ থেকে ছুটী নিয়ে একবার এদিকে এস।' নয়নবৌ মৃদু হাসিয়া কহিল, 'যাও যাও ঠাকুরপো, ওনার আর তর সইচে না।' প্রবোধ উঠিয়া ধীরে ধীরে সদরের দিকে চলিল। প্রবোধ ঘরে প্রবেশ করিতেই গোপাল কহিল, 'বসো, তোমার সঙ্গে একটা

পরামর্শ আছে। প্রবোধ গোপালের নিকট উপবিষ্ট হইয়া কহিল, 'কেন বল ত? ব্যাপার কি!'

গোপাল বলিতে লাগিল, 'তুমি বোধ হয় জান, নানা কারণে জনাই আমাদের নানা রকমে বিপদগ্রস্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। সে যে রকম ভীষণ প্রকৃতির লোক, তাতে একটা কিছু করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়, তার লোকবলও যথেষ্ট। কাল রাত্রে কলু-বাড়ীতে রোগের জন্য গিয়েছিলাম, মাঝ-রাত্রে একবার ডাক্তার ডাকবার প্রয়োজন হয়। ডাক্তারবাড়ী যাবার সময় দরজা দিয়ে যখন যাই, তখন সেখানে জনাইকে দেখে আমার সন্দেহ হয়। আমি আড়ালে থেকে শুন্‌লাম, আমার বাড়ী ডাকাতি কর্‌বার এবং আগুন লাগাবার পরামর্শ হচ্ছে। আজ রাত্রেই তারা তাদের কার্য্যসিদ্ধি কববে ঠিক করেছে। এখন বল কি করি।"

প্রবোধ স্থির চিত্তে গম্ভীর ভাবে কহিল, 'জনাই বেটা যে কত বড় পাজি তা আমি জানি। আচ্ছা, দেখা যাক তার বুদ্ধির কত বড় দৌড়। দেখ গোপাল, এখানকার যে দারোগা, সে আমার পরম বন্ধু। কলেজের বন্ধু হলেও এখনো সে আমার খাতির রাখে। আমি গিয়ে তাকে সব কথা খুলে বলি, সে আমার সাহায্য করবেই আর তার করাও উচিৎ। তারপর কতদূর কি করতে পারি দেখা যাক্।' বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

সেদিন অপরাহ্নে নয়ন বৌ আপনার গৃহে বসিয়া রামায়ণ পাঠ করিতেছিল। উঠি-উঠি করিয়াও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

না করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এরূপ সময়ে ঊষা গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল, 'মা, তোমায় ডাকছে।' নয়ন বৌ পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, 'কে মা?' তাহার কথা শেষ না হইতেই বিজন গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল, 'মা, আমি কাল ক'লকাতায় চলে যাব, তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

নয়ন বিস্মত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সে কি বাবা, হঠাৎ তুমি দেশ ছেড়ে ক'লকাতায় যাবে কেন?'

বিজন নতমুখে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নয়ন পুস্তকখানি মুড়িয়া ঊষাকে কহিল, 'মা, বিজনকে একটা আসন এনে দাও। ঊষা আসনখানি আনিলে নয়ন বৌ বিজনকে কহিলেন, 'বোসো বাবা, বোসো।'

বিজন বসিলে নয়ন বৌ কহিলেন, 'হঠাৎ তোমার চলে যাবার কারণ বুঝিতে পারছি না বাবা।'

বিজন ধীরে ধীরে কহিল, 'মা, আমার জন্যেই আপনাদের এই লাঞ্ছনা।'

ঊষা ধীরে ধীরে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। নয়ন বৌ বিস্মিত হইয়া উত্তর কবিল, 'আমাদের লাঞ্ছনা তোমার জন্যে? ছি ছি, ও কথা বলো না বাবা। সুখ-দুঃখ, মান-অপমান লাঞ্ছনা এ যে দেবার তিনিই দেন, তবে ভাল এবং মন্দ এই দু'টোর মধ্যেই তার শুভ ইচ্ছা দেখতে পেলেই ভাবনা চিন্তা কষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

আমাদের এই অপমান লাঞ্ছনা যে মঙ্গলের জন্যে নয়, তা তোমায় কে বল্লে? তবে তুমি এ জন্যে কেন দুঃখ পাও আর নিজেকেই বা এর কারণ বলে ভেবে কষ্ট পাচ্ছ কেন?"

বিজন রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, 'কিন্তু লোকে যে বলে।'

নয়ন বৌ মৃদু হাসিয়া কহিল, যে লোকেরা বলে, তারা দুশ্চরিত্র, ইতর, এ জেনেও যারা তাদের কথা অগ্রাহ্য করতে পারে না, তারা ঠিক পুরুষের মত কাজ করে না বাবা, আর তুমি নিজেকে বেশ জান, তোমাকেও আমারা ভাল করে জানি! কোন দিক দিয়েই ত' তোমার কোন কষ্টের কারণ থাকতে পারে না। দেশ ছেড়ে মিথ্যা বিদেশ যাবার অনর্থক কল্পনা ছেড়ে দাও—তোমরাই ত' দেশের ভরসা। দেশে থেকে দেশের এবং সঙ্গে সঙ্গে দশের সেবাই যে তোমাদের ধর্ম্ম। কথায় কথায় দেশ ছেড়ে যাওয়া আর আত্মহত্যা এ দুই-ই সমান।'

দেশের কথা কয়টি নয়ন বৌ একটু জোর করিয়াই বলিয়াছিল, 'কে আত্মহত্যা কর্‌লে আবার বৌদি, বলিতে বলিতে প্রবোধ উঠান হইতে বারান্দায় উঠিল এবং যে ঘরে নয়ন বৌ বসিয়াছিল, তাহার সম্মুখে আসিয়া বিজনকে দেখিয়াই কহিল, 'বিজন যে রে!'. বিজন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, 'বসুন প্রবোধ কাকা!' প্রবোধ আসন গ্রহণ করিয়া কহিল, 'হাঁ, আত্মহত্যার কথা কি বলছিলে?'

নয়ন বৌ মৃদু হাসিয়া কহিল, 'বলছিলুম, তুমি আত্মহত্যা করেছ।' প্রবোধ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কহিল, 'আমি!'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি। বিজনকে বলছিলাম, দেশ ছেড়ে যারা অনর্থক বিদেশে যায়, তারা আত্মহত্যা করে।' প্রবোধ উচ্চ হাসিয়া কহিল, 'ওঃ, এই?' পরে গম্ভীর হইয়া কহিল, 'কিন্তু কি করি বলুন। পেটকে ত' আপনারাই বলেন বড় বালাই। যাক্, এই নিয়ে পরে একদিন আপনার সঙ্গে কথা হবে। এখন বলুন, গোপাল-দা কোথায়।'

নয়ন বৌ কহিল, 'উনি বোধ হয় ঘটকের সঙ্গে ও-পাড়ায় গেছেন। আসতে সন্ধ্যে হবে নিশ্চয়ই।'

প্রবোধ কহিল, 'ওঃ, বটে। আচ্ছা, সন্ধ্যের সময়ই এসে দেখা করবো অখন? তা হলে আসি বৌদি' বলিয়া প্রবোধ প্রস্থান করিল।

তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে, নয়ন বৌ সংসারের কাজ সারিয়া, তুলসী-তলায় গঙ্গাজল ও আলো দিতেছিল। এমন সময় গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রবোধ প্রবেশ করিল। বাহিরের বারান্দায় একখানি মাদুরের উপর গা এলাইয়া দিয়া গোপাল বিশ্রাম করিতেছিল, প্রবোধকে আসিতে দেখিয়া কহিল, 'এস, ভাই এস।'

প্রবোধ বারান্দায় উঠিয়া মাদুরের এক পাশে বসিয়া কহিল, 'কতক্ষণ এলে?'

গোপাল কহিল, 'এই ত, এইমাত্র এলুম। তারপর এদিকের তুমি কি করলে?'

প্রবোধ কহিল, 'আমি এদিকের সব ঠিক করেছি। আজ

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সকালে দারোগাকে গিয়ে সব খুলে বলেছি, তিনি যতদূর করবার করবেন, সেজন্য তুমি ভেবো না। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে এখানে এসে আজ শোবো! দারোগা—পুলিশ-পাহারা নিয়ে গুপ্তবেশে আসে-পাশে লুকিয়ে থাকবে। বেটারা আজ যদি এদিকে আসে ত' নিস্তার নেই জেনো।'

গোপাল কহিল, 'নিজের জন্য কখন ভাবিনি ভাই, কারণ, চিরদিনই জানি, ভগবান রক্ষে করলে মানুষের সাধ্য নেই কাউকে বিপদে ফেলে, কিন্তু ভাবনা যত মেয়েদের নিয়ে। কারণ, কতকগুলো লক্ষ্মীছাড়া ইতর—সমাজের দোহাই দিয়ে মিথ্যা আচারের ভান দেখিয়ে—নিরীহ নারীদের কি লাঞ্ছনাই না করে—তার যে কোন প্রতীকার নেই।'

প্রবোধ কহিল, 'সে কথা পরে হবে, এখন আসন্ন বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকো, সেই কথাই বলতে এলাম। আমি যাই, খাওয়া দাওয়া সেরে আসছি' বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

নয়ন বৌ ধীরে ধীরে গোপালের নিকটে আসিয়া কহিল, 'তোমাদের এত পরামর্শ কিসের?'

পরামর্শ একটু ছিল, সে তোমার শুনে কাজ নেই।' বলিয়া গোপাল চিন্তিত মনে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

নয়ন বৌ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, 'ও-পাড়ায় যে গেলে, তার কি হল?'

'কই, কিছুই হলো না। একবার দেখে আসা দরকার বলেই ঘটকের সঙ্গে গিয়াছিলাম।'

কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া সে কহিল, 'এ তোমায় বলে রাখছি নয়ন, উপযুক্ত পাত্র ছাড়া, উষাকে আমি বিয়ে দিতে পারব না।'

নয়ন বৌ মৃদুকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল, 'দেখ, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে ক'দিন থেকে ভাবছি।'

গোপাল কহিল, 'তোমার মনের কথা স্বচ্ছন্দে আমায় বলতে পার। তোমার কোন কথা বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও কোন কথা ত' বলিনি নয়ন!'

নয়ন বৌ বলিতে লাগিল, 'দেখ, আমার ইচ্ছে, বিজনের সঙ্গে উষার বিয়ে দি। বিজনকে আমি এতদিন দেখে আসছি, তার হাতে উষাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব। লেখা পড়া ও স্বভাব চরিত্রে বিজন চিরকালই ভাল। আর সে ত' তোমারই ছাত্র, ওদের অবস্থাও বেশ সচ্ছল, সব দিক দিয়েই বিজনকে উপযুক্ত পাত্র বলে আমার মনে হয়। তোমার কি মত?'

গোপাল হাসিয়া কহিল, 'মত ত' আমার ভিন্ন হ'তে পারে না। তবে ওর মা বাপের মতটা যে আগে জানা দরকার।'

নয়ন বৌ কহিল, 'তোমরা বেটাছেলে, তার ভার তোমার ওপর।'

গোপাল অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিল, 'আচ্ছা দেখি।'

নয়ন বৌ কি কাজে উঠিয়া অন্দরের দিকে প্রস্থান করিল।

বাহিরে তখন প্রকৃতির চারিধারে অন্ধকার গাঢ় হইয়া জমিয়া উঠিতেছিল। ঝিল্লির অবিরাম কর্কশ-ধ্বনি ঘন অন্ধকারের বুক ভরিয়া তুলিতেছিল। জোনাকির ম্লান আলোটুকু ইতঃস্তত জ্বলিতেছিল—আবার নিভিতেছিল। দিবসের শান্ত কোলাহল—অন্ধকার-আবরণের অন্তরালে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হইয়া, স্তব্ধ হইয়া আসিতেছিল।

গোপাল এতক্ষণ বাহিরে বসিয়াছিল। বিভিন্ন চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে সে সেই সময় দেশ কাল বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া, সে ত্রাস্তে উঠিয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার বহুদিনের পুরাতন বিশ্বস্ত লাঠি গাছটীকে যেন সচেতন করিবার জন্য দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। অতীত কালে নিজের এবং পরের কত ভীষণ বিপদের সম্মুখে এই লাঠি গাছটীকেই নির্ভর করিয়া বুক ফুলাইয়া সে দাঁড়াইয়াছে। তাহার বাহু-শক্তি এই লাঠি গাছটীকেই কেন্দ্র করিয়া নিরীহের উপর দুর্জ্জনের অত্যাচারকে পরাহত ও বিদ্ধস্ত করিয়াছে। আজ পুনরায় বিপদের সূচনা হওয়ার পূর্ব্বে তাহার চির বিশ্বস্ত লাঠি গাছটিকে বন্ধুর মতই বক্ষের পাশে রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহিরের বারান্দায় ফিরিয়া আসিয়া মাদুরের উপর উপবেশন করিল।

নয়ন বৌ কিছুকাল পরে আসিয়া জানাইল, 'আহার প্রস্তুত।'

গোপাল কহিল, 'তুমি আর উষা খেয়ে নাও, আমি একটু পরে খাব, প্রবোধের আসবার কথা আছে, তার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

নয়ন বৌ ফিরিতেছিল, হঠাৎ স্বামীর পার্শ্বে লাঠি গাছটাকে দেখিয়া সে উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আবার লাঠি বার করেছ! তোমার পাশে ওকে দেখলে বড় ভয় করে। কি হয়েছে বল না শুনি' বলিয়া সে বসিবার উপক্রম করিতেই গম্ভীর কণ্ঠে গোপাল কহিল, 'তোমরা খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করগে। এখন তোমায় আমি কিছু বলতে পারব না।' স্বামীর এইরূপ উত্তরে তাহার অন্তরখানি এক অজানিত আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল।

নয়ন বৌ স্বামীর কথার কোন উত্তর না দিয়া ভারাক্রান্ত অন্তরে—অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। কিছুকাল পরেই প্রবোধ গোপালের নিকট আসিলে, দুই জনে নানারূপ পরামর্শে রত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি যখন প্রায় দুইটা, তখন হঠাৎ গোপালের বাড়ীর সম্মুখে ভীষণ গোলমাল আরম্ভ হইল। ধর, পাকড়াও, মার

ইত্যাদি শব্দে পল্লীবাসী সচকিত হইয়া উঠিল। গোলমাল কিয়ৎ পরিমাণে থামিলে জানা গেল—জনাই, রমাই প্রভৃতি গোপালের বাড়ীতে ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল। পুলিশ-প্রহরী তাহাদিগকে সদলবলে ধরিয়া ফেলিয়াছে। গোপালের বাড়ীর সম্মুখে তখন ভীষণ জনতা শৃঙ্খলাবদ্ধ জনাইয়ের দলকে লইয়া ব্যস্ত। এইরূপ সময় কয়েকজন 'আগুন' 'আগুন' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দেখা গেল, ঘোষালের বাড়ীর পশ্চাতে আগুন লাগিয়াছে। জনাইয়ের দলকে কড়া পাহারায় রাখিয়া সকলে বাড়ীর পশ্চাৎ দিকে যাইতেই অনেকে দেখিল, এক মনুষ্য মূর্ত্তি বাড়ীর পশ্চাতে বনের ভিতর দিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছে। সমাগত লোকদিগের মধ্য হইতে প্রবোধ ছুটিয়া মনুষ্য মূর্ত্তির অনুসরণ করিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাকে ধরিয়া গোপালের বাড়ীর সম্মুখে আনয়ন করিলে দেখা গেল, মনুষ্য মূর্ত্তি আর কেহ নহে—স্বনামধন্যা রজনী।

এদিকে অগ্নি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া বিশেষ ক্ষতি করিবার পূর্ব্বে সমবেত সকলে তাহা নিবাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল।

তখন সকলে মিলিয়া রজনীকে জেরায়-জেরায় অস্থির করিয়া তুলিল—'তুমি কেন আসিয়াছিলে? বাড়ীর পশ্চাৎ দিকে তোমার কি কাজ, পলাইতেছিলে কেন?'—ইত্যাদি ইত্যাদি। রজনী নিতান্ত নিরীহের মতন উত্তর করিল যে, গোলমাল শুনিয়া এবং বাড়ীর সম্মুখে জনতা দেখিয়া সে

খিড়কীর দুয়ার দিয়া বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে গোলমালের কারণ জানিতে গিয়াছিল, প্রবোধ তাহাকে অন্যায় ভাবে ধরিয়া অপমানিত করিয়াছে।

জনাই তাহা শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওর আবার অপমান! ওই ত' আমাদের লোভ দেখিয়ে গোপাল বোসের বাড়ী ডাকাতির মতলব দিয়েছে।' বলিয়া সে রমাই প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'কেমন কিনা, তোরাই বল না রে?' সকলে একবাক্যে বলিল, 'ওরই মতলবে ত' আজ এখানে এসে ধরা পড়লুম। ছাড়া পেলে এখনই ঐ মাগীর নাক, আর কান দুটো কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে দি।'

উপস্থিত গ্রামবাসীরা উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল!

দারোগাবাবু গোপালের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'আপনার বাড়ীতে ডাকাতি হবার সংবাদ পূর্ব্বে পেয়ে আমি বদমায়েসদের ধরবার সুযোগ পেয়েছি। আমি বিলম্ব করতে পারব না। এদের নিয়ে আমি থানায় চল্লাম' বলিয়া তিনি প্রহরীদিগকে আসামীদের লইয়া থানায় যাইতে আদেশ দিলেন।

পর দিন প্রভাতেই প্রবোধ গোপালকে কহিল, 'মানুষের মত মানুষ থাকলে জনাই এতদিন সমাজের ভেতর থেকে মাথা নাড়তে পারত না এইটেই আমরা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলাম। এখন কথা হচ্ছে, ঊষার বিয়ে। আমার মত যে, তুমি যত শীঘ্র পার ওর বিয়ে দেবার চেষ্টা কর—আমিও দেখছি এদিকে।'

গোপাল উত্তর দিল, 'উষার বিয়ের সম্বন্ধে তুমি নয়ন বউয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে যা বোঝ, কর—তাঁর ইচ্ছে, বিজনের সঙ্গে উষার বিয়ে হয়।'

প্রবোধ মৃদু হাসিয়া কহিল, 'ওঃ, এই? আচ্ছা দেখি, কি বলেন বউদিদি' বলিয়া অন্দরের দিকে প্রস্থান করিল।

রাত্রি জাগরণ-ক্লান্ত নয়ন বৌ ঘরের এক কোণে বসিয়া পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনা সকল স্মরণপথে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রবোধ ঘরে প্রবেশ করিতেই নয়ন বৌ মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, 'খুব দেখলুম ঠাকুরপো তোমার দেশের'......

প্রবোধ কহিল, 'আর আমরা যা দেখলুম, তা বুঝি মনে ধরলো না?'

নয়ন বৌ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'সেই কথাই ভাবছিলুম এতক্ষণ।'

প্রবোধ কহিল, 'কিন্তু আমারা সে ভাবনা অনেক্ষণ ছেড়ে দিয়েছি। বাজে জিনিস ভেবে আমরা মাথা নষ্ট করি না। আমি ভাবছি এখন উষার বিয়ের কথা। এইবার উষার বিয়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হবো। শুনলুম, তুমি নাকি বিজনের সঙ্গে উষার বিয়ে দেবে ঠিক করেছো?'

নয়ন বৌ কহিল, 'ঠিক কিছু করিনি, তবে মনে করেছি। যতক্ষণ না তার বাপ মায়ের মত হয় ততক্ষণ এর কিছুই ঠিক হতে পারে না।'

প্রবোধ কহিল, 'আচ্ছা, তবে তাঁদের মত করবার ভার আমিই নিলাম।'

নয়ন বৌ, 'তা হলে ত' ভালই হয়। তোমরা একটু উঠে পড়ে লাগ না ঠাকুরপো।'

'সে তোমায় বল্‌তে হবে না বৌদি। আচ্ছা, আমি তবে এখন আসি, তোমরা রোজ যেমন কাজকর্ম্ম কর, আজকেও তেমনি ভাবে করে যাও। মনে ক'রো, যেন কিছুই ঘটেনি। বলিয়া প্রবোধ চলিয়া গেল।

সেইদিন বৈকালেই প্রবোধ হাসিমুখে নয়ন বৌ'র নিকট আসিয়া কহিল, 'তাদের কখনও অমত হতে পারে?'

নয়ন বৌ হাসিতে হাসিতে কহিল, 'কাদের গো?'

প্রবোধ কহিল, 'কাদের আবার? বিজনের বাপ মা দুজনেরই। তাঁদের মত করিয়ে তবে আমি এইখানে তোমাদের খবর দিতে এলুম।'

উল্লিখিত ঘটনার প্রায় দুইমাস পরে উষার সহিত বিজনের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল।

বিচারে তাহাদের ডাকাতি প্রমাণ হওয়ায়—জনাই প্রভৃতি সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশে আদিষ্ট হইয়া জেলে প্রেরিত হইয়াছিল। রজনীও দণ্ডাদেশ হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

যতদিন জনাই প্রভৃতি নিঃসঙ্কচিত্তে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইত, নিরীহ সকলে ভয়ে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। যাহারা কাহারও কিছু অনিষ্ট বা সর্ব্বনাশের

চেষ্টায় থাকিত, জনাই ছিল তাহাদের ভরসা। জনাইয়ের কারাদণ্ডাদেশে গ্রামে অনেক পরিমাণে শান্তি স্থাপিত হইল। কারণ, নিরীহ সকলে স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রামের ভিতরে আপনার এবং পরের কাজ নির্ব্বিঘ্নে করিবার অবসর পাইল। যাহারা দুষ্ট প্রকৃতি. তাহারা জনাইয়ের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া, যাহারা কিছু ভাল তাহাদের বিরুদ্ধে কাজ করিবার সৌভাগ্য হারাইল।

গোপাল এবং গোপালের ছাত্রের দল প্রবোধের সহায়তায় গ্রামের ভিতরে তদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায় তাহাদিগের সকল প্রচেষ্টা নিযুক্ত করিল। এমনই করিয়া দিনের পর দিন গ্রামের উন্নতি, পরোপকার, লোকহিতকর অনুষ্ঠান করিয়া তাহারা অচিরেই গ্রামের সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইল। গোপালের কন্যার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপিত হওয়ায় বিজনের পিতা মাতা প্রথমে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমতি না দিলেও শেষে গ্রামের ভিতরে গোপালের ক্রিয়া কলাপাদি দেখিয়া এবং তাহার গুণসকল স্বচক্ষে দেখিয়া এবং বুঝিয়া তাহার কন্যাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ করিতে কোন প্রকারে অমত করিতে পারিলেন না।

বিবাহক্রিয়া-সম্পন্ন হইয়া গেলে নয়ন বৌ—গোপাল এবং প্রবোধকে সজল চক্ষে কহিল, 'মনের মতন পাত্রের হাতে উষাকে দিতে পেরেছি বলে কেবলই আমার মনে হয়, ভগবানের কৃপা থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হব না'।

প্রবোধ কহিল, ‘ঐ বিশ্বাসটুকু আছে বলেই কোন বিপদকে কখন গ্রাহ্য করিনি।’

গোপাল কহিল, ‘মায়ের আমার বিয়ে দিয়ে সংসারের কাছে হিসেব নিকেশ চুকিয়েছি। এক নয়ন বৌ—তার জন্য আমি কোন দিন ভাবি না। এখন বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। সেখানে কোন বাধা বিঘ্ন আর আমার শক্তিকে পরাস্ত করতে পারবে না।’

উজ্জ্বল পরিচ্ছেদ

* * * * *

তাহাদিগের মধ্যে যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন পল্লীর আর একদিকে একটি বাড়ীর একখানি গৃহে বিজন উষাকে কহিতেছিল, 'আমার জন্যেই ত' তোমাদের এত কষ্টভোগ করতে হ'লো।'

উষা স্বামীর মুখে হাত রাখিয়া তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল, 'আবার ওকথা বলছো? তুমি আমাদের বিপদের কারণ, না সম্পদের কারণ? তুমি আমাকে পায়ে স্থান দেবার পর থেকেই, দেখনি কি যে, এ গ্রাম দিনের পর দিন কেমন উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। আর ত' কোথাও কোন গোলমাল নেই! চারিদিকে কেমন সুখ, শান্তি। এর কারণ কি জান?—তুমি!'

ইহা শুনিতে শুনিতে বিজন তাহাকে দুই হস্তে আলিঙ্গন করিয়া বুকের নিকট টানিয়া আনিবার পূর্ব্বেই—গলায় আঁচল দিয়া উষা স্বামীর পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল।

অমৃত

তমসাচ্ছন্ন উপন্যাস-সাহিত্যাকাশে
বিদ্যুত বিকাশ!

?

— নবাব আলীবর্দ্দীর স্নেহ-পুত্তলি —

বাংলা-মসনদের সোখীন-আলাল—
বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার—নবাব-দুলাল

নবাব-তক্তের বনিয়াদি নবাব

— সেই —

নবাব সিরাজউদ্দৌলা !!!

'কমলিনীর'—'রাজপুতের মেয়ে' প্রণেতা

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাধের রচনা

চিত্রবহুল নবাবী-উপাখ্যান

— নবাব —

সিরাজউদ্দৌলা

বিশ্ব-বিশ্রুত-চিত্র-শিল্পীগণের
বিশ্ববিমোহন চিত্রাবলী ভূষিত হইয়া
শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।